মার্কসবাদী দৃষ্টিতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও পরবর্তী বামপন্থী আন্দোলনের সমস্যা — প্রভাস ঘোষ

প্রথম প্রকাশ ঃ ৫ আগস্ট, ২০১৫
দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ ১০ ডিসেম্বর, ২০১৫
তৃতীয় মুদ্রণ ঃ ১০ মে, ২০১৬

প্রকাশক ঃ মানিক মুখার্জী
কেন্দ্রীয় কমিটি, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)
৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩
ফোন ঃ ২২৪৯-১৮২৮, ২২৬৫-৩২৩৪

লেজার কম্পোজিং ও মুদ্রণ ঃ
গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩

মূল্য ঃ ১০ টাকা

মার্কসবাদী দৃষ্টিতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও পরবর্তী বামপন্থী আন্দোলনের সমস্যা

প্রভাস ঘোষ

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

প্রকাশকের কথা

আমাদের দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠা দিবসে ২৪ এপ্রিল, ২০১৫ অন্যান্য বহু রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গেও রাজ্য কমিটির আহ্বানে কলকাতার শহিদ মিনার ময়দানে বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় প্রধান বক্তা সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের পূর্ণ ভাষণ 'গণদাবী'র ৬৭ বর্ষ ৪২ সংখ্যা (১২ - ১৮ জুন, ২০১৫) ও ইংরেজি অনুবাদ 'প্রলেটারিয়ান এরা' ৪৮ বর্ষ ২২ সংখ্যায় (১ জুলাই, ২০১৫) প্রকাশিত হয়েছে। ৫ আগস্ট, ২০১৫ ভাষণটি প্রথম পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয় এবং ১০ ডিসেম্বর, ২০১৫ দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশ করার সময় পুস্তকটির নতুন নামকরণ করা হয়।

বর্তমানে পুস্তিকাটির তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশ করা হল।

১০ মে, ২০১৬ **মানিক মুখার্জী**

মার্কসবাদী দৃষ্টিতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও পরবর্তী বামপন্থী আন্দোলনের সমস্যা

১৯৪৮ সালে পার্টির প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতি বছরই প্রতিষ্ঠা দিবস ২৪ এপ্রিল আমাদের কাছে বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে আসে। সমসাময়িক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক যেসব সংকট জনজীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলছে, সেগুলি কী কী, কেন এই সংকট দেখা দিচ্ছে ও বাড়ছে, সেগুলি জানা এবং সর্বহারা বিপ্লবী দল হিসাবে মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় কীভাবে সমস্যাগুলিকে আমরা বিচার করতে পারি ও কর্তব্য নির্ধারণ করতে পারি, সেই সব বিষয়ে আলোচনার জন্যই আজকের এই সমাবেশ।

গণতন্ত্র আজ প্রহসন

আমাদের দেশের নেতারা দীর্ঘদিন ধরে সগর্বে দাবি করে থাকেন যে, ভারতবর্ষ পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে কলকাতা কর্পোরেশন নির্বাচনে একদফা এই 'গণতান্ত্রিক নির্বাচন যজ্ঞ' আপনারা প্রত্যক্ষ করলেন, আগামী কালও প্রত্যক্ষ করবেন — কত রক্ত ঝরল, কত খুন-জখম হল, কাল আরও হবে। ১৯৭২ সাল থেকেই পশ্চিমবঙ্গে প্রতিটি নির্বাচন এইভাবে 'অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ' হয়ে চলেছে। আজ যারা সরকারের বিরোধী পক্ষে আছে, তারা সরকারে যখন ছিল এভাবেই ক্ষমতা দখল করেছে। তখন যারা বিরোধী ছিল এখন সরকারে বসে তারাও একই ভাবে ক্ষমতা দখল করছে। এটাই যেন স্বাভাবিক। শুধু প্রশ্ন, কে বেশি আর কে কম করেছে। এ ভাবেই লোকসভা, বিধানসভা, কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি, পঞ্চায়েতের ভোট হয়। যথারীতি ভোটার লিস্ট তৈরি হয়, ভোটের জন্য আলাদা আইন থাকে, 'নিরপেক্ষভাবে পরিচালনার' জন্য কমিশন থাকে, কোথাও যাতে 'জবরদস্তি, সন্ত্রাস' না হয় তার জন্য 'সতর্ক পুলিশ প্রশাসন' থাকে, 'ভোটে যাতে টাকার খেলা না হয়', 'কারচুপি না হয়' — এ সব দেখারও বন্দোবস্ত থাকে। এ সবই আপনারা জানেন। কিন্তু

তারপর ভোটের সময় কী দেখেন! সব ব্যবস্থাই ভোজবাজির মতো মিলিয়ে যায়। গণতন্ত্র, জনগণ, অবাধ নির্বাচন সবই প্রহসনে পরিণত হয়। আগেকার দিনে রাজা - জমিদাররা যেমন সশস্ত্র বাহিনী নামিয়ে রক্তারক্তি করে একে অপরের রাজত্ব দখল করত, এখনও তাই ঘটে। জোর যার মুলুক তার, জনগণ এখানে নিমিত্ত মাত্র।

এ জিনিস শুধু আমাদের রাজ্যে বা এ দেশেই নয়, সমগ্র পুঁজিবাদী দুনিয়াতেই চলছে। কোথাও নগ্ন ভাবে, কোথাও প্রচ্ছন্নভাবে। বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসির ঠাটবাট সবই আছে, নেই শুধু ডেমোক্রেসি। জনগণ নয়, সর্বত্রই নির্বাচনে প্রথম ও শেষ কথা মানি পাওয়ার বা বুর্জোয়া শ্রেণিই। তারাই ঠিক করে কোন বিশ্বস্ত চাকরকে এবার গদিতে বসাবে বা পুনর্বহাল করবে অথবা পাল্টাবে। আবার কারা মেইন অপোজিশনে যাবে, সেটাও বুর্জোয়ারাই ঠিক করে। সেভাবেই মানি পাওয়ার, মিডিয়া পাওয়ার, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পাওয়ার ও মাস্‌ল পাওয়ার কাজ করায়।

সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণী নিয়ে যে বুর্জোয়া গণতন্ত্র মানব ইতিহাসে নবযুগের সূচনা করেছিল, আজ তার কী ট্র্যাজিক পরিণতি

রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করে যে প্রজাতন্ত্র একদিন গণতন্ত্র, সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী নিয়ে মানব ইতিহাসে নবযুগের সূচনা করেছিল, আজ দেখুন তার কী ট্র্যাজিক পরিণতি!

সতেরো, আঠেরো, উনিশ শতকে যে ক্ষুদ্র বুর্জোয়ারা ভূমিদাসদের সংগঠিত করে রাজতন্ত্রের অবসানের জন্য লড়েছিলেন তাঁরা ছিলেন বিপ্লবী। তাঁরা ভাবতেও পারেননি তাঁদের সৃষ্ট বুর্জোয়া গণতন্ত্রের একদিন এই পরিণতি ঘটবে। সেদিন বাজারে অসংখ্য ক্ষুদ্র পুঁজির অবাধ, স্বাধীন প্রতিযোগিতা ছিল, এরই রাজনৈতিক প্রতিফলন হিসাবে মাল্টিপার্টি ডেমোক্রেসি ও ফ্রি ইলেকশন এসেছিল। শ্রমিক জনগণও তার কিছু সুযোগ নিতে পারত। তখন বণিকি পুঁজির গর্ভে জন্ম নেওয়া শিল্প পুঁজি আঞ্চলিক বাজারের গণ্ডি ভেঙে জাতীয় বাজার সৃষ্টি করেছে, জাতীয় পুঁজিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এরই প্রয়োজনে জাতীয় শিল্প, জাতীয় বাজার, জাতীয়তাবাদ, জাতীয় সংস্কৃতি, ধর্মান্ধতা মুক্ত মানবতাবাদ, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এসব ধারণা এসেছে। এ হল পুঁজিবাদের প্রগতিশীল স্তর। কিন্তু ইতিহাসের নিয়মেই কালক্রমে জাতীয় পুঁজি বিকাশের পথে একচেটিয়া পুঁজির জন্ম দিল, অবাধ প্রতিযোগিতার স্তর ধ্বংস করল, পূর্বে প্রদত্ত গণতান্ত্রিক অধিকারও হরণ করল, ব্যাঙ্ক পুঁজি-শিল্প পুঁজির সংমিশ্রণে লগ্নি পুঁজির (ফিনান্স ক্যাপিটাল) জন্ম দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী স্তরে অন্য দেশ দখল, স্বাধীনতা হরণ ও লুণ্ঠন শুরু করে দিল। এ হল পুঁজিবাদের চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল স্তর। এই স্তরে এক দেশের একচেটিয়া পুঁজি অন্য

দেশের একচেটিয়া পুঁজির সাথে মিলে মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশনের জন্ম দিল। এক সময়ে জাতীয় পুঁজির বিকাশের স্বার্থে জনগণকে জাতীয়তাবাদী চেতনায় ও জাতীয় স্বাধীনতাবোধে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিল। এখন সাম্রাজ্যবাদী স্তরে সেই পুঁজিবাদ শুধু অন্য দেশের জাতীয় স্বাধীনতাকেই হরণ করছে তা নয়, মাল্টিন্যাশানাল পুঁজির স্তরে এসে নিজ দেশের জাতীয় স্বার্থকেও তুচ্ছ জ্ঞান করছে। এখন দেশের সার্বভৌমত্ব বা স্বাধীনতা নয়, পুঁজির সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতাই মূল স্বার্থ। দেশ, জনগণ, রাষ্ট্র সবই এই সার্বভৌম পুঁজির স্বার্থের অধীন। যেখানে সর্বাধিক মুনাফা, সেখানেই পুঁজি ছুটছে। এমনকী নিজ দেশের জাতীয় শিল্প ও অর্থনীতির ক্ষতি করেও বিদেশে উৎপাদন বা কাজ করিয়ে আনছে (আউটসোর্সিং), নিজের দেশের অর্থনীতির নানা ক্ষেত্রে বিদেশি পুঁজির বিনিয়োগ (এফ ডি আই) ডেকে আনছে, বিদেশ থেকে সস্তা শ্রমিক আমদানি করছে নিজ দেশের শ্রমিককে ছাঁটাই করে। তার কাছে জাতীয় স্বার্থ বলতে ততটুকু বোঝায়, যতটুকু নিজ দেশের বাজারে আধিপত্য রক্ষা, অন্য দেশের উপর হামলায় ও দখলদারি কায়েম রাখায় জাতীয় সেন্টিমেন্টকে ব্যবহার করার জন্য দরকার। এ কথা ভারতের একচেটিয়া পুঁজিপতি ও মাল্টিন্যাশনালদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। 'বিলেতি দ্রব্য বর্জন কর, স্বদেশি দ্রব্য গ্রহণ কর'— এই স্লোগানের দিন আজ পুঁজিপতিদের কাছে অতীত। মনে করুন, শুধুমাত্র খদ্দর পরার অপরাধে একদিন এদেশে কত লোক ব্রিটিশ পুলিশের মার খেয়েছিল। কারণ সেদিন জাতীয় পুঁজির বিকাশের প্রয়োজনেই বিলেতি কাপড় বর্জন করে দেশি কাপড় খদ্দর পরার স্লোগান এসেছিল। আজ পুঁজির বিশ্বায়নের স্তরে জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে আগেকার ধারণা বুর্জোয়াদের কাছে পুরনো এবং অচল।

ফ্যাসিবাদ সকল পুঁজিবাদী দেশেরই বৈশিষ্ট্য

আপনারা অনেকেই জানেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্যাসিস্ট জার্মানি-ইটালির পরাজয়ের ফলে এই ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল যে, ফ্যাসিবাদ শেষ হয়ে গেছে। শুধু একটি কণ্ঠস্বর — মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ সেই ১৯৪৮ সালেই বলেছিলেন, ফ্যাসিস্ট সামরিক শক্তি যুদ্ধে পরাস্ত হলেও আজ ফ্যাসিবাদ উন্নত-অনুন্নত সমস্ত পুঁজিবাদী দেশেরই বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, যদিও তার রূপ ও মাত্রায় দেশে দেশে পার্থক্য আছে। পুঁজির একেন্দ্রীকরণ, রাষ্ট্রের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিক কেন্দ্রীভূত হওয়া এবং আদর্শগত ক্ষেত্রে অধ্যাত্মবাদ ও কারিগরি বিজ্ঞানের অদ্ভুত সংমিশ্রণ — ফ্যাসিবাদের এই তিনটি বৈশিষ্ট্য তিনি দেখিয়েছেন। কংগ্রেসের সময় থেকেই আমাদের দেশে এই ফ্যাসিবাদী বৈশিষ্ট্য গড়ে তোলা হচ্ছিল। বি জে পি ক্ষমতায় এসে এই বিপদ আরও বাড়িয়ে দিল। সি পি এম, সি পি আই নেতৃত্ব ফ্যাসিবাদের এই বিপদ বুঝছেন না। তারা তাদের পার্টি

কংগ্রেসের বক্তব্যে এটাকে শুধুমাত্র 'রাইটিস্ট অফেনসিভ' (দক্ষিণপন্থী আক্রমণ) বলে চিহ্নিত করেছে। কিন্তু আমরা ওদের মঞ্চে দাঁড়িয়েই বলেছি, এটা ফ্যাসিবাদের বিপদ, যেটা আরও ভয়ঙ্কর, শুধু রাইটিস্ট অফেনসিভ বললে এর তাৎপর্য অনেক লঘু হয়ে যায়।

ফ্যাসিবাদ যেকোনও জাতির ক্ষেত্রে ভয়াবহ সর্বনাশ সৃষ্টি করে। এক সময় দর্শনে, অর্থনীতিতে, শিল্পে-সাহিত্যে জার্মানির স্থান কত উঁচুতে ছিল। ফ্যাসিবাদ সেই দেশকে কোথায় নামিয়ে আনল, গোটা দুনিয়ায় কত ধ্বংসকাণ্ড করল, আপনারা জানেন। এই ফ্যাসিবাদ যে কত ভয়ঙ্কর সে সম্পর্কে কমরেড শিবদাস ঘোষ বহুদিন আগেই বলেছিলেন, "মনে রাখবেন, একটা জাতি খেতে না পেলেও উঠে দাঁড়ায়, না খেয়েও সে লড়ে, যদি মনুষ্যত্ব থাকে। কিন্তু ফ্যাসিবাদ গড়ে উঠলে মানুষ বলতে দেশে আর বিশেষ কেউ থাকবে না। কারণ মানুষ গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় সে বাধা সৃষ্টি করে।" (শিবদাস ঘোষ নির্বাচিত রচনাবলী, চতুর্থ খন্ড) তিনি আরও বলেছিলেন, "একদিকে সে মানুষের চিন্তাভাবনাগুলোকে মেরে দিয়ে তাকে আত্মকেন্দ্রিক করে তোলে। মানুষের জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধিকে কারিগরিমুখী করে তোলে। অর্থাৎ দেশে একদল শিক্ষিত কারিগর সৃষ্টি করে, যারা মানবিক মূল্যবোধ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত। মানুষের প্রতি এবং সমাজের প্রতি যাদের কোনও দায়িত্ববোধ নেই। যারা চাকুরিকে ও গোলামিকে সর্বস্ব মনে করে, পয়সার বিনিময়ে যারা যা কিছু করতে পারে। অপরদিকে যত অধ্যাত্মবাদ, সেকেলে যত কুসংস্কার, যত যুক্তিহীন মানসিকতা এবং অন্ধতাকে গড়ে তোলে। ফ্যাসিবাদ হচ্ছে অধ্যাত্মবাদ, তমসাচ্ছন্ন ভাবনা-ধারণা এবং যুক্তিহীনতার সাথে কারিগরি বৈজ্ঞানিক বিদ্যার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ।" (নির্বাচিত রচনাবলী, চতুর্থ খন্ড)

আর-এস-এস এবং বিজেপি যুক্তিবাদী সমাজমনন ধ্বংস করতে চায়

বি জে পি ক্ষমতায় আসার পর কীরকম 'আচ্ছে দিন' জনগণের জন্য এনেছে, সেটা প্রতিদিনই আপনারা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। কিন্তু আরেকটা আক্রমণ শুরু করেছে, যেটা আরও বিপজ্জনক। জার্মানিতে হিটলারও এতটা পারেনি। হিটলারও বলতে পারেনি বা বলেনি যে আধুনিক বিজ্ঞানের সব আবিষ্কারই বাইবেলে ছিল, জার্মানির পুরনো ঐতিহ্যে ছিল। কিন্তু আর এস এস-বিজেপি নেতারা সগর্বে দাবি করছেন, কোপারনিকাস, ব্রুনো, গ্যালিলিও, নিউটন থেকে শুরু হয়ে আইনস্টাইন, প্ল্যাঙ্ক, হাইজেনবার্গ, রাদারফোর্ড এবং আমাদের দেশের জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, সত্যেন বসু, সি ভি রমন, মেঘনাদ সাহা, রামানুজম, চন্দ্রশেখর প্রমুখ বিজ্ঞানীরা অত কঠিন সাধনা ও পরীক্ষা করে যা কিছু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেছেন সেগুলি নাকি নতুন কিছুই নয়, সবই প্রাচীন ভারতে বৈদিক যুগের ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা আবিষ্কার

করেছেন! সেই ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা আজ বেঁচে থাকলে এ সব শুনে লজ্জা পেতেন কিনা জানি না, কিন্তু তাদের পরম ভক্তরা নির্লজ্জের মতো আজ এ সব দাবিই করছেন। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী এমনও দাবি করছেন যে, গণেশের মূর্তিই প্রমাণ করে যে, প্রাচীন যুগে এ দেশে প্লাস্টিক সার্জারি কত উন্নত ছিল! এ সবই করা হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ নষ্ট করে, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী মন, বৈজ্ঞানিক বিচার পদ্ধতির প্রতি মানসিকতা নষ্ট করে বেদ-গীতা-রামায়ণ-মহাভারতের ধর্মীয় কল্পিত কাহিনির দিকে দেশের মননকে চালিত করার উদ্দেশ্যে। বিজ্ঞানের চর্চা থাকবে কারিগরি ক্ষেত্রে, মেশিন ও যুদ্ধাস্ত্র তৈরির জন্য, কিন্তু চিন্তার জগতে 'বেদ বাক্য অভ্রান্ত', 'অলঙঘনীয়', 'মনুসংহিতার বিধান', 'যাহা নাই মহাভারতে, তাহা নাই ভূভারতে', 'গীতার বাণী' — এ সবেরই প্রাধান্য বাড়াতে চায়। উদ্দেশ্য হচ্ছে একদিকে যুক্তিবাদী মন, প্রশ্ন করার ও চিন্তা করার মনকে এবং বৈজ্ঞানিক বিচারবোধ ধ্বংস করা, অন্যদিকে উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদ জাগিয়ে তোলা, ধর্মান্ধতা ও অধ্যাত্মবাদ জাগিয়ে তোলা। আপনাদের আগেই বলেছি, হিটলারও এতটা পারেনি, এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল। বৈজ্ঞানিক মেঘনাদ সাহার একটি কাহিনী শুনলে আপনারা হাসবেন। তিনি গরিব ঘরের ছিলেন, কষ্ট করে পড়েছেন, বৈজ্ঞানিক সাধনা করে নতুন আবিষ্কার করেছেন, চারিদিকে তাঁর প্রশংসা হচ্ছে। তাঁর বাবার এক বন্ধু ঢাকায় নামকরা উকিল ছিলেন। তিনি একদিন মেঘনাদ সাহাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এমন কী আবিষ্কার করেছ যে এত হই চই হচ্ছে। মেঘনাদ সাহা তাঁকে যত্ন সহকারে বোঝাতে শুরু করলেন। কিছুটা শুনে সেই বৃদ্ধ উকিল বললেন, 'এতে আর নতুন কী আছে, এ সবই তো বেদে আছে!' মেঘনাদ সাহা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন বেদে আছে? তিনি নির্দ্বিধায় উত্তর দিলেন, 'তা আমি জানি না, কিন্তু আমি জানি সবই বেদে আছে'। মেঘনাদ সাহা নিজে এ কথা লিখে গেছেন। সেই বৃদ্ধ উকিল আজ বেঁচে থাকলে মোদি সরকার নিশ্চয়ই তাঁকে 'ভারতরত্ন' খেতাবে ভূষিত করত, আর মেঘনাদ সাহার ডক্টরেট ডিগ্রি কেড়ে নেওয়া হত।

বিবেকানন্দের মানদণ্ডে আরএসএস-বিজেপির রাজনীতি

তখন দেশে আজকের মতো দুরবস্থা ছিল না। এত বিপুল সংখ্যক মেরুদণ্ডহীন বুদ্ধিজীবী ছিল না, কিছু মানুষের মতো মানুষ ছিল। আপনারা অনেকে জানেন কিনা জানি না, বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় দুঃখ করে লিখে গেছেন, প্রাচীন ভারতেও গ্রিসের মতো বিজ্ঞান চর্চা শুরু হয়েছিল, কিন্তু বেদান্তের মায়াবাদ বস্তুজগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করায়, তার প্রভাবে এ দেশে বিজ্ঞানের অগ্রগতি থেমে গিয়েছিল। আর এস এস-এর যেসব পণ্ডিতরা নতুন নতুন তত্ত্ব হাজির করছেন, তাঁরা শুনলে দুঃখ পাবেন যে, তাঁদের সমস্যা স্বয়ং বিবেকানন্দই সৃষ্টি করে গেছেন। বিবেকানন্দই

বলছেন, 'চাই ওয়েস্টার্ন সায়েন্সের সঙ্গে বেদান্ত, ...' (বাণী ও রচনা) এ কথার দ্বারা বোঝা যায় বিবেকানন্দ বিজ্ঞানে ইউরোপের অগ্রগতিকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। অবশ্য আর এস এস পণ্ডিতরা বলতে পারেন, বিবেকানন্দ সেকেলে লোক, ভারতের ধর্মগ্রন্থগুলি তাঁর ভালো করে জানা নেই, না হলে এ ভুল তিনি করতেন না। বিবেকানন্দ ওদের জন্য আরও একটি বিপদ সৃষ্টি করে গেছেন। ইউরোপে ধর্মবাদীরা যেভাবে বিজ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের উপর আক্রমণ করেছে, তার নিন্দা করে বিবেকানন্দ বলেছেন, "ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে আধুনিক জ্যোতির্বিদ ও বৈজ্ঞানিকদের মতবাদ কী, তা আমরা জানি। আর ইহাও জানি যে, উহা প্রাচীন ধর্মতত্ত্ববিদদের কীরূপ ক্ষতি করিয়াছে; যেমন যেমন এক-একটি নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হইতেছে অমনি যেন তাঁহাদের গৃহে একটি করিয়া বোমা পড়িতেছে, আর সেই জন্যই তাঁহারা সকল যুগেই এই সকল বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বন্ধ করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন" (বাণী ও রচনা)। এই বিবেকানন্দ সম্পর্কে আর এস এস পণ্ডিতরা কী বলবেন! শুধু কি তাই? বিবেকানন্দ নিজেই বেদান্তকে ভারতের জাতীয় ধর্ম করার বিরোধিতা করে বলেছেন, "বেদান্তে কোনও সম্প্রদায়, ধর্ম বা জাতি বিচার নাই। কীভাবে এই ধর্ম ভারতের জাতীয় ধর্ম হইতে পারে?" (বাণী ও রচনা)। আরেক জায়গায় বলছেন, "কোনও ধর্মই কখনও মানুষের উপর অত্যাচার করেনি, কোনও ধর্মই ডাইনি অপবাদে নারীকে পুড়িয়ে মারেনি, কোনও ধর্মই এই ধরনের অন্যায় কার্যের সমর্থন করেনি। তবে মানুষকে এইসব কাজে উত্তেজিত করল কীসে? রাজনীতিই মানুষকে এই সব অন্যায় কাজে প্ররোচিত করেছে, ধর্ম নয়"(বাণী ও রচনা)। বিবেকানন্দের এই বিচারের মানদণ্ডে আর এস এস-বিজেপির রাজনীতির চরিত্র কী দাঁড়ায়?

আর এস এস-বিজেপি একটা ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধ বাবরি মসজিদ ভাঙলো ওটা রামের জন্মস্থান দাবি করে। আর বিবেকানন্দ কী বলছেন শুনুন, 'রামায়ণের কথাই ধরুন — অলঙ্ঘনীয় প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে উহাকে মানিতে হইলেই যে রামের ন্যায় কেহ যথার্থ ছিলেন স্বীকার করিতে হইবে, তাহা নহে। রামায়ণ বা মহাভারতের মধ্যে যে ধর্মের মাহাত্ম্য ঘোষিত হইয়াছে তাহা রাম বা কৃষ্ণের অস্তিত্ব-নাস্তিত্বের উপর নির্ভর করে না, ...কোনও পুরাণে বর্ণিত দার্শনিক সত্য কত দূর প্রামাণ্য, তাহার বিচার করিতে হইলে ঐ পুরাণে বর্ণিত ব্যক্তিগণ বাস্তবিকই ছিলেন অথবা তাঁহারা কাল্পনিক চরিত্র মাত্র, এ বিচারের কিছুমাত্র আবশ্যকতা নেই।" (বাণী ও রচনা) এই বিবেকানন্দ বেঁচে থাকলে কি বাবরি মসজিদ ভাঙতে দিতেন, না দণ্ড হাতে রুখে দাঁড়াতেন! যেমন, ধর্মীয় মৌলবাদের নামে যেভাবে শিয়া-সুন্নির সংঘর্ষ চলছে, নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চলছে, নারী নির্যাতন চলছে, প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন ধ্বংস করা হচ্ছে, হজরত মহম্মদ থাকলে কি তরোয়াল নিয়ে রুখে দাঁড়াতেন

না? আমরা মার্কসবাদী, নিরীশ্বরবাদী, কিন্তু প্রাচীন ধর্মপ্রচারকদের ঐতিহাসিক ভূমিকাকে শ্রদ্ধা করি। আমরা মনে করি, হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ধর্মীয় মৌলবাদীরা তাদের ধর্মপ্রচারকদের আদর্শকে পদদলিত করছে — ধর্মের স্বার্থে নয়, হীন রাজনৈতিক স্বার্থে।

আরএসএস ভারতীয় নবজাগরণ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধী

আজকের এই সভায় দাঁড়িয়ে আমি আর এস এস-বিজেপির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করছি যে, তারা ভারতের নবজাগরণ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধতা করেছে, ঐ মহান ঐতিহ্যকে অস্বীকার করছে। তাঁরা প্রমাণ করুন আমরা মিথ্যা বলছি।

ধর্মীয় অন্ধকারাচ্ছন্ন দীর্ঘ যুগের অবসানের উদ্দেশ্যে যিনি প্রথম নবজাগণের আলো জ্বালিয়ে ছিলেন, সেই রাজা রামমোহন রায় সংস্কৃত শিক্ষার বিরুদ্ধতা করে লর্ড আমহার্স্টকে লিখেছেন, "সংস্কৃত শিক্ষা ব্যবস্থা দেশকে অন্ধকারে নিমগ্ন রাখার একটি সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ"। (রামমোহন রচনাবলী) অথচ সেই সংস্কৃত শিক্ষাকে ব্যাপকভাবে চালু করার জন্য আজ আর এস এস-বিজেপি নেতারা উঠে পড়ে লেগেছেন। এটা কি রামমোহনের ভাষায় 'দেশকে অন্ধকারে নিমগ্ন' রাখার একটি সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ নয়? তিনি বেদান্ত শিক্ষারও বিরুদ্ধতা করে বলেছেন, "... যে বৈদিক মতবাদ বিশ্বাস করতে শেখায় যে, কোনও দৃশ্যমান বস্তুরই বাস্তব অস্তিত্ব নেই, তা যুবকদের সমাজের উন্নত সদস্য হিসাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উপযোগী হবে না। ...গণিতশাস্ত্র, বস্তুবাদী দর্শন, রসায়ন, শারীরবিদ্যা সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করে উন্নততর গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে"(রামমোহন রচনাবলি)। বিদ্যাসাগর, যিনি সেই যুগে সকল শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, তিনি আরেক ধাপ এগিয়ে বললেন, "...কতকগুলি কারণে সংস্কৃত কলেজে বেদান্ত ও সাংখ্য আমাদের পড়াতেই হচ্ছে। ...কিন্তু সাংখ্য ও বেদান্ত যে ভ্রান্ত দর্শন, তা আর বিবাদের বিষয় নয়, তবে ভ্রান্ত হলেও এই দর্শনের প্রতি হিন্দুদের গভীর শ্রদ্ধা আছে। আমাদের উচিত সংস্কৃত পাঠক্রমে এগুলি পড়ানোর সময়ে, এদের প্রভাব কাটানোর জন্য ইংরেজি পাঠক্রমে খাঁটি দর্শন দিয়ে এগুলির বিরোধিতা করা। ... ভারতীয় পণ্ডিতদের গোঁড়ামি আরব খলিফার চেয়ে কম নয়। তাঁদের বিশ্বাস, যে ঋষিদের মস্তিষ্ক থেকে শাস্ত্রগুলি বেরিয়েছে, তাঁরা সর্বজ্ঞ, অতএব তাঁদের রচিত শাস্ত্র অভ্রান্ত" (বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ)। কাদের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করতে হবে এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "এমন শিক্ষক চাই, যারা বাংলা ভাষা জানে, ইংরেজি ভাষা জানে, আর ধর্মীয় সংস্কার মুক্ত" (বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ)। বেদ-বেদান্ত-ধর্ম শাস্ত্রের প্রভাব থেকে ছাত্রদের মন মুক্ত করে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী করার জন্য এই মনীষী

সারা জীবন কি কঠিন সংগ্রাম করে গেছেন!

শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগর একা দাঁড়িয়ে প্রবল সংগ্রাম করে শেষজীবনে দুঃখ করে বলেছিলেন, "এ দেশের উদ্ধার হইতে বহু বিলম্ব আছে, পুরাতন প্রকৃতি ও প্রবৃত্তিবিশিষ্ট মানুষের চাষ উঠাইয়া দিয়া সাত পুরু মাটি তুলিয়া ফেলিয়া নতুন মানুষের চাষ করিতে পারিলে, তবে এ দেশের ভালো হয়" (ঐ)। দেখুন, খুব দুঃখের সাথে এ কথা বললেও এর মধ্যে একটা সঠিক পথনির্দেশও তিনি দিয়ে গেছেন। বলেছেন, বেদ-বেদান্ত-মনুসংহিতাভিত্তিক যে শিক্ষা দীর্ঘদিন ধরে চলে এসেছে এবং তার ফলে সমাজের জমিতে যে সংস্কারবাদ ও ধর্মীয় প্রবৃত্তিভিত্তিক চাষ বা শিক্ষাদান হয়েছে, সেটাকে প্রথমে বন্ধ করতে হবে এবং এর ফলে সমাজের মনন জমিতে যে আবর্জনা জমে সাত পুরু ভাঁজ পড়েছে, প্রথমে সেই মাটি উপড়ে ফেলে দিতে হবে, তারপর নতুন বিজ্ঞানভিত্তিক গণতান্ত্রিক শিক্ষা বা নতুন মানুষের চাষ করতে হবে। আজকের আর এস এস-বিজেপি নেতারা ঠিক তার উল্টো কাজই করছেন। যতটুকু সামান্য বৈজ্ঞানিক শিক্ষার চর্চা চলছিল, তাকেও সম্পূর্ণ বন্ধ করে 'পুরাতন প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি বিশিষ্ট মানুষের' চাষের উপর আরও জোর দিচ্ছেন। আর এস এস-বিজেপি ভারতের 'আর্য ও হিন্দু' ঐতিহ্যের উপর জোর দিচ্ছে। অন্যদিকে দেখুন, রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "কেহ নাহি জানে, কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা, দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে, সমুদ্রে হল হারা। হেথা আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন — শক-হুন-দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।" তিনি আরও বলেছেন, "আমাদের শিল্প সাহিত্য বেশভূষা রাগরাগিনী ধর্মকর্মের মধ্যে মুসলমানের সামগ্রী মিশিয়াছে। মনের সঙ্গে মনের মিলন না হইয়া থাকিতে পারে না"(সাহিত্য সৃষ্টি)।

ধর্মের মিল নিয়ে তিনি কী বলছেন শুনুন। তিনি বলছেন, "যে দেশে প্রধানত ধর্মের মিলেই মানুষকে মেলায়, অন্য কোনও বাঁধনে তাকে বাঁধতে পারে না, সে দেশ হতভাগ্য। সে দেশ স্বয়ং ধর্মকে দিয়ে যে বিভেদ সৃষ্টি করে সেটি সকলের চেয়ে সর্বনেশে বিভেদ"। (কালান্তর, হিন্দু-মুসলিম) আর এস এস- বিজেপি নেতারা কি রবীন্দ্রনাথের চিন্তার বিরুদ্ধতা করছেন না?

এবার আপনাদের পড়ে শোনাব ভারতীয় নবজাগরণের বলিষ্ঠতম প্রতিনিধি শরৎচন্দ্রের কয়েকটি মূল্যবান বক্তব্য। বিচার করে দেখুন সেই যুগে কীভাবে ধর্মীয় চিন্তা, অধ্যাত্মবাদের প্রভাব থেকে এদেশের মানুষের মননকে মুক্ত করে গণতান্ত্রিক সেক্যুলার ভাবধারা আনার জন্য তিনি কী কঠিন লড়াই করে গেছেন! শরৎচন্দ্র সেই সময় বিপ্লববাদের পক্ষে ছিলেন, আবার বিপ্লবীদের অনেকের মধ্যেই ধর্মীয় চিন্তার প্রভাব লক্ষ করে তাঁদের তার থেকে মুক্ত করার জন্য 'পথের দাবী' উপন্যাসে বলেছেন, "সমস্ত ধর্মই মিথ্যা, আদিম দিনের কুসংস্কার। বিশ্ব মানবতার এতবড় শত্রু

আর নেই।" বলেছেন, "তোমরা বল চরম সত্য, পরম সত্য, এই অর্থহীন নিষ্ফল শব্দগুলো তোমাদের কাছে মহা মূল্যবান। মূর্খ ভোলাবার এতবড় যাদুমন্ত্র আর নেই। তোমরা ভাব, মিথ্যাকেই শুধু বানাতে হয়, সত্য শাশ্বত, সনাতন, অপৌরুষেয়। মিছে কথা। মিথ্যার মতোই একে মানবজাতি অহরহ সৃষ্টি করে চলে। শাশ্বত, সনাতন নয়, সত্যেরও জন্ম আছে, মৃত্যু আছে।" 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে বলেছেন, "কোনও ধর্মগ্রন্থই অভ্রান্ত সত্য হতে পারে না। বেদও ধর্মগ্রন্থ, সুতরাং এতেও মিথ্যার অভাব নেই। ...যা সত্য তাকেই সকল সময় সকল অবস্থায় গ্রহণ করবার চেষ্টা করবে। তাতে বেদই মিথ্যা হোক, আর শাস্ত্রই মিথ্যা হয়ে যাক।" 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসে বলেছেন, "বিশেষ কোনও একটা দেশে জন্মেছি বলে তারই নিজস্ব আচার-আচরণ চিরদিন আঁকড়ে থাকতে হবে কেন? গেলই বা তার বিশেষত্ব নিঃশেষ হয়ে। এতই কি মমতা! বিশ্বের সকল মানব যদি একই চিন্তা একই ভাব একই বিধি-নিষেধের ধ্বজা বয়ে বেড়ায় কী তাতে ক্ষতি? ভারতীয় বলে চেনা যাবে না, এই তো ভয়? নাই বা গেল চেনা? বিশ্বের মানবজাতির একজন বলে পরিচয় দিতে তো কেউ বাধা দেবে না। তার গৌরবই বা কম কীসে।"

এতক্ষণ আপনাদের ভারতীয় নবজাগরণের কয়েকজন মনীষীর কিছু উদ্ধৃতি পড়ে শোনালাম। এবার আপনারাই বিচার করে দেখুন, আর এস এস-বিজেপি কীভাবে এঁদের শিক্ষাগুলিকে লঙ্ঘন করে দেশকে আবার সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আর এস এস যোগ দেয়নি

এবার আর এস এস-বিজেপি নেতাদের প্রশ্ন করতে চাই, আজ যে তাঁরা এত 'দেশপ্রেমের বন্যা' বইয়ে দিচ্ছেন, যখন দেশের স্বাধীনতার জন্য হাজার হাজার মানুষ কারাবরণ করছিলেন, শত শত ছাত্র-যুবক গুলিতে-ফাঁসিতে প্রাণ দিচ্ছিলেন, তখন আজকের 'দেশপ্রেমিক' আর এস এসের কী ভূমিকা ছিল? কোথাও কি স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁরা সামান্য ভূমিকাও নিয়েছিলেন? নাকি তাঁরা নাগপুরের আশ্রমে দেশের মুক্তির জন্য তপস্যায় মগ্ন ছিলেন? অনুশীলন সমিতির অন্যতম পুরোধা, যিনি আন্দামান সহ ব্রিটিশ ভারতে ও পরে পাকিস্তানে ৩০ বছর জেলে কাটিয়েছিলেন সেই শ্রদ্ধেয় ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (মহারাজ) দুঃখ করে তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, তিনি নেতাজিকে সমর্থন করার জন্য আর এস এস প্রধানকে অনুরোধ করেও ব্যর্থ হয়েছিলেন। আরও শুনুন। ১৯৪২ সালের আগস্ট অভ্যুত্থানে আর এস এস-এর যোগ না দেওয়ায় তৎকালীন বোম্বাইয়ের স্বরাষ্ট্র সচিব সন্তুষ্ট হয়ে কেন্দ্রীয় ব্রিটিশ সরকারকে আর এস এস-এর পক্ষে সার্টিফিকেট দিয়ে ১৯৪৪ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি লিখেছিলেন, "সংঘ নিষ্ঠার সঙ্গে নিজেকে সরকারি

আইনের চৌহদ্দির মধ্যে রেখেছে ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪২ সালে যে গোলমাল শুরু হয়েছিল, সংঘ তাতে কোনওরকম অংশগ্রহণ করেনি"। (দি আর এস এস অ্যান্ড দি বি জে পি— এ জি নুরানি) 'দেশপ্রেমিক' আর এস এস নেতারা এ সবের কী উত্তর দেবেন !

অবশ্য তাদের এই ভূমিকা স্বাভাবিকই ছিল। কারণ তাদের অভিমত হচ্ছে, যেহেতু স্বাধীনতা আন্দোলন অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে মূল শত্রু গণ্য করে পরিচালিত হয়েছিল, তাই তা প্রকৃত হিন্দু জাতীয়তাবাদ থেকে ভারতবাসীকে বঞ্চিত করেছিল, স্বাধীনতা আন্দোলনকে কার্যত ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে পর্যবসিত করেছিল ; ব্রিটিশ বিরোধিতাকে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবাদের সমার্থক করা হয়েছিল। তাঁদের মতে এটা ছিল প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তা যার সর্বনাশা প্রভাব সমগ্র স্বাধীনতা আন্দোলন, তার নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ মানুষের উপর পড়েছিল। এটা আমাদের কথা নয়, স্বয়ং আর এস এস-এর গুরু গোলওয়ালকর 'We and our Nationhood Defined' পুস্তকে লিখছেন, ''The theories of territorial nationalism and of common danger, which formed the basis for our concept of nation, had deprived us of the positive and inspiring content of our real Hindu nationhood and made many of the freedom movements virtually anti-British movements. Being anti-British was equated with patriotism and nationalism. This reactionary view has had disastrous effects upon the entire course of the independence struggle, its leaders and the common people.'' ফলে আর এস এস-এর বিচারে সমগ্র স্বাধীনতা আন্দোলন, বিপ্লবীদের লড়াই, আজাদ হিন্দ বাহিনীর লড়াই যথার্থ দেশাত্মবোধ ছিল না। সুভাষচন্দ্র, ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, সূর্য সেন, চন্দ্রশেখর আজাদ হতে শুরু করে দেশবন্ধু, তিলক, লালা লাজপৎ, কেউই প্রকৃত দেশপ্রেমিক ছিলেন না, প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতাকে দেশপ্রেম বলা চলে না। এখন বিচার করে দেখুন, এই আর এস এস-এর ঝান্ডা বহন করলে তার দ্বারা কি এ দেশের বীর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ও স্বাধীনতা সংগ্রামকে অসম্মান করা হয় না?

স্বাধীনতা আন্দোলনে আপসমুখী নেতৃত্বের ভূমিকার কারণেই আরএসএস-এর শক্তিবৃদ্ধি

আবার এ কথাও আপনাদের জানা দরকার যে, আর এস এস- বি জে পি কিংবা ধর্মীয় মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা এতবড় শক্তি নিয়ে আসতেই পারত না, যদি স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বের মধ্যে চিন্তা ও ভূমিকায় গুরুতর গলদ না

থাকত। আমাদের দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনে লড়েছে সাধারণ মানুষ। সর্বস্ব দিয়ে লড়েছে, প্রাণ দিয়েছে গরিব-মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে-মেয়েরা, টাটা-বিড়লার ঘরের ছেলেরা নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নেতৃত্ব ছিল জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণির হাতে। এ দেশে তখন যথার্থ শ্রমিকশ্রেণির দল হিসাবে কোন পার্টি গড়ে ওঠেনি। মনে রাখবেন, পুঁজিবাদের অভ্যুদয়ের যুগে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণি ইউরোপে অধ্যাত্মবাদ ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে লড়াই করে গণতান্ত্রিক বৈজ্ঞানিক মনন প্রতিষ্ঠার জন্য ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত বা সেক্যুলার মানবতাবাদের ঝান্ডা বহন করেছিল, নবজাগরণের ঝান্ডা বহন করেছিল সপ্তদশ-অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকে। ইতিমধ্যে বিংশ শতাব্দীতে সেই পুঁজিবাদ একচেটিয়া পুঁজিবাদ বা সাম্রাজ্যবাদী স্তরে এসে চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র অর্জন করার ফলে সেই ঝান্ডা বুর্জোয়া শ্রেণি ফেলে দিয়েছে। ইতিমধ্যে ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় শ্রমিক বিপ্লব পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করেছে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে। এই শ্রমিক বিপ্লবের ভয়ে বিশ্বপুঁজিবাদ তখন ভীত সন্ত্রস্ত এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তার বিরোধী। এই সময়ে গড়ে ওঠা ভারতের জাতীয় পুঁজিবাদ বিশ্বপুঁজিবাদের অঙ্গ হিসাবে যথারীতি বিপ্লব বিরোধী হয়ে পড়ে। তাই পুঁজিবাদের প্রথম যুগের বৈপ্লবিক বৈশিষ্ট্য সে বহন করতে পারেনি। সেদিন ভারতের জাতীয় বুর্জোয়া নেতৃত্ব একদিকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবের বিরোধিতা করেছে, বিপ্লবীদের কংগ্রেসের নেতৃত্বে আসতে বাধা দিয়েছে, সাম্রাজ্যবাদের সাথে বোঝাপড়া ও আপসের পথে ক্ষমতায় আসতে চেয়েছে, অন্যদিকে রামমোহন-বিদ্যাসাগর-ফুলে-শরৎচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-প্রেমচাঁদ-নজরুলদের নবজাগরণের চিন্তাকে বহন করার পরিবর্তে ধর্মীয় চিন্তা, অধ্যাত্মবাদী মননকে মদত দিয়েছে। গান্ধীজি নিজের অজ্ঞাতসারেই এই জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণিস্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, সশস্ত্র বিপ্লববাদের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। এমনও বলেছেন, "এমনকী আমাকে যদি নিশ্চয়তা দেওয়া হত যে, সশস্ত্র সংগ্রামের পথে স্বাধীনতা আসবে আমি সেটা প্রত্যাখ্যান করতাম, কারণ সেটা যথার্থ স্বাধীনতা হত না" (সোস্যালিজম ইন মাই কনসেপশন)।

সুভাষচন্দ্রের সেকুলার অভিমত ছিল

গান্ধীজি কতটা সশস্ত্র বিপ্লববাদ বিরোধী হলে এ কথা বলতে পারেন! নেতাজির প্রতি তাঁর বিরুদ্ধতা এখান থেকেই। শরৎচন্দ্র সেই যুগে যথার্থই বলেছিলেন, "গান্ধীজির আসল ভয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে। তাঁকে ঘিরে রয়েছে বণিকরা, ব্যবসায়ীরা।" (বর্তমান রাজনৈতিক প্রসঙ্গে) অন্যদিকে মধ্যযুগীয় অন্ধকারাচ্ছন্ন ধর্মীয় চিন্তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পরিবর্তে গান্ধীজি বুর্জোয়া স্বার্থে সর্বধর্ম সমন্বয়ের নামে অধ্যাত্মবাদকে উৎসাহ দিলেন, গীতা-রামায়ণ-কোরান-

বাইবেল হাতে নিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনা করলেন। ফলে যথার্থ সেক্যুলার জাতীয়তাবাদী চিন্তা এ দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের সামনে ছিল না, ছিল ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ। মুখে সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা বললেও বাস্তবে তা ছিল মূলত হিন্দু ধর্মভিত্তিক, তাও নেতৃত্ব ছিল তথাকথিত উচ্চবর্ণের হাতে। যার ফলে শুধু ব্যাপক মুসলিম জনগণই নয়, তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দুরাও এই আন্দোলনে সামিল হয়নি। স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতাদের এই চেহারা দেখে শরৎচন্দ্র দুঃখ করে বলেছিলেন, "যাঁদের হওয়া উচিত ছিল সন্ন্যাসী, তাঁরা হলেন পলিটিশিয়ান, তাই ভারত পলিটিক্সে এতবড় দুর্গত।" (শরৎ রচনাবলী) এমনকী ভগৎ সিংকে বাদ দিলে অনুশীলন, যুগান্তর এইসব বিপ্লবী সংগঠনের অধিকাংশ নেতা-কর্মীরাও ভাবগত ক্ষেত্রে ধর্মীয় চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। গান্ধীবাদীরা তো নয়ই, এমনকী এঁরাও নবজাগরণের চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের উদ্যোগ নেননি। শরৎচন্দ্র ওঁদের এই ত্রুটি লক্ষ্য করেই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা স্মরণ করিয়ে বলেছিলেন, "বিপ্লবের সৃষ্টি মানুষের মনে, অহেতুক রক্তপাতে নয়। তাই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হয়। ক্ষমাহীন সমাজ, প্রীতিহীন ধর্ম, জাতিগত ঘৃণা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, মেয়েদের প্রতি চিত্তহীন কঠোরতা — এর আমূল প্রতিকারের বিপ্লবপন্থাতেই শুধু রাজনৈতিক বিপ্লব সম্ভবপর হবে।" (শরৎ রচনাবলী) দুঃখের বিষয় শরৎচন্দ্রের এই মূল্যবান বক্তব্যের তাৎপর্য সেদিন নেতারা অনুধাবন করতে পারেননি। রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে একমাত্র সুভাষচন্দ্রই সেই যুগে সেক্যুলার মতবাদ ব্যক্ত করে বলেছিলেন, "ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে রাজনীতি হইতে বাদ দেওয়া উচিত। ধর্ম ব্যক্তি বিশেষের বিষয় হওয়া উচিত। ব্যক্তি হিসাবে মানুষ যে ধর্ম পছন্দ করে, তাহা অনুসরণ করার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে। কিন্তু ধর্ম কিংবা অতীন্দ্রিয় বিষয়ের দ্বারা রাজনীতি পরিচালিত হওয়া উচিত নহে। ইহা পরিচালিত হওয়া উচিত শুধু অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক বিচার বুদ্ধির দ্বারা" (সুভাষ রচনাবলি)। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রাধান্য পেল না। কারণ আপনারা জানেন, ভারতীয় পুঁজিবাদ এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বকে আতঙ্কের চোখে দেখত, তাই দক্ষিণপন্থী গান্ধীবাদীদের দিয়ে নেতাজিকে কংগ্রেস নেতৃত্ব থেকে অপসারণ করেছিল। তার ফলে সমগ্র স্বাধীনতা আন্দোলনটাই ধর্মভিত্তিক চিন্তা দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল, নবজাগরণের সেক্যুলার মানবতাবাদ জনমানসে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। এরই সুযোগ নিয়ে পরবর্তীকালে আর এস এস মাথা তুলে দাঁড়াতে পারল। ফলে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের দক্ষিণপন্থী ধর্মীয় আপসকামী নেতৃত্বই আর এস এস-এর জমি তৈরি করে দিয়েছিল। সুভাষচন্দ্র নেতৃত্বে থাকলে এ দেশের পরিস্থিতি অন্যরকম হত।

কেন এবং কীভাবে সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস নেতৃত্ব বিতাড়ন করল

কেন এবং কীভাবে ষড়যন্ত্র করে সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস সভাপতির পদ ছাড়তে বাধ্য করা হল এবং শেষপর্যন্ত কংগ্রেস থেকে সাসপেন্ড করা হল, সেই ইতিহাস কয়জন জানেন? সম্প্রতি হঠাৎ খবর বের হল পণ্ডিত নেহেরু প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন সুভাষচন্দ্রের বাড়িতে গোয়েন্দাগিরি করাতেন। এ নিয়ে হইচই শুরু হয়ে গেল, সব নেতারা ঝাঁপিয়ে পড়ল, কে কতটা ফয়দা তুলতে পারে। কিন্তু অতীতের এই সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে কেউ একবার টুঁ শব্দও করছে না। আপনারাও অনেকে জানেন না। কারণ স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এ সব নিয়ে কোনও কিছুই উল্লেখ করা হয়নি, যাতে দেশের মানুষ জানতে না পারে। নেতাজি প্রথমবার হরিপুরা কংগ্রেসের প্রাক্কালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতাতেই কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। কারণ তখনও গান্ধীবাদীরা তাঁকে বিপদ হিসাবে বুঝতে পারেননি। কিন্তু নেতাজি হরিপুরা কংগ্রেস অধিবেশনের ভাষণে যখন (১) সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করলেন এবং সমাজতন্ত্রকে লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা করলেন, (২) স্বায়ত্বশাসনের পরিবর্তে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করলেন, (৩) জমিদারি প্রথার অবসান চাইলেন, (৪) শ্রমিক-কৃষকদের স্বাধীনতা আন্দোলনে সামিল করার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করলেন — তখনই ভারতীয় পুঁজিবাদ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসিরা প্রমাদ গুনলেন। নেতাজি মার্কসবাদী ছিলেন না, কিন্তু বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী হিসাবে মার্কসবাদ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছিলেন। এ সব কারণেই পরবর্তী সভাপতি নির্বাচনে গান্ধীজি সরাসরি নেতাজির বিরুদ্ধে পট্টভি সীতারামাইয়াকে দাঁড় করালেন। ভারতীয় ও ব্রিটিশ পুঁজি নিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যম এবং নেহেরু-প্যাটেলরা পট্টভির পক্ষে ব্যাপক প্রচার করেও নেতাজিকে হারাতে পারলেন না, মূলত দেশের বিপ্লবী ছাত্র-যুব শক্তির সমর্থনে নেতাজি জয়যুক্ত হলেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে দক্ষিণপন্থীরা ঠিক করল নেতাজিকে কিছুতেই সভাপতি হিসাবে কাজ করতে দেবে না। নেতাজি তখন রোগশয্যায়। সেই অবস্থাতেই নেতাজির আপত্তি সত্ত্বেও তারা কংগ্রেস অধিবেশন ডাকাল। ত্রিপুরী কংগ্রেস অধিবেশনে গান্ধীবাদী গোবিন্দবল্লভ পন্থকে দিয়ে প্রস্তাব আনাল, যার মূল কথা ছিল, (১) গান্ধীজির অনুমোদন ছাড়া কংগ্রেস সভাপতি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে পারবেন না। (২) গান্ধীজির অনুমোদন ছাড়া কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না। এই প্রস্তাবের ভোটাভুটিতে নেতাজি পরাস্ত হলেন। কেন পরাস্ত হলেন, নেতাজির ভাষাতেই বলছি, "ত্রিপুরীতে আমার পরাজয় হল। এই পরাজয় হচ্ছে, একদিকে রোগশয্যায় শায়িত একজন ব্যক্তি আর অন্যদিকে ১২ জন বাঘা বাঘা

কংগ্রেস নেতা, সাতটি রাজ্যের কংগ্রেস মন্ত্রী এবং সর্বোপরি গান্ধীজির মতো একজন নেতার নাম, ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব। এ ছাড়া এদের সাথে যুক্ত হল সি এস পি (কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি)-র বিশ্বাসঘাতকতা এবং তাদের সাথে হাত মিলিয়েছিল সি পি আই" (ক্রসরোডস)। কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি ও অবিভক্ত সি পি আই সেদিন নেতাজীর বিরুদ্ধে দক্ষিণপন্থীদের সাহায্য করল। পন্থ প্রস্তাব অনুযায়ী বাধ্য হয়ে নেতাজি ওয়ার্কিং কমিটি গঠনে কয়েকবার গান্ধীজির মতামত চাইলেন, প্রত্যেকবারই গান্ধীজি মতামত দিতে অস্বীকার করলেন এবং পন্থ প্রস্তাব না জানার ভানও করলেন। ওয়ার্কিং কমিটি গঠন না করে নেতাজি কাজ করতে পারছিলেন না। এ সম্পর্কে ব্রিটিশ ঐতিহাসিক মাইকেল এডওয়ার্ডস লিখেছিলেন, 'গান্ধীজি নেতাজির বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অস্ত্র প্রয়োগ করেছিলেন'। কংগ্রেসে অচলাবস্থা সৃষ্টি হল। এর জন্য নেহেরুরা নেতাজিকে দায়ী করে প্রচার শুরু করল। শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে নেতাজি ১৯৩৯ সালে কলকাতায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এ আই সি সি অধিবেশন ডেকে সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিলেন। অর্থাৎ ভারতীয় পুঁজিবাদ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসিরা তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করল। এর কয়েকদিন পর সুভাষচন্দ্র, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের ডাক দেওয়ায় তাঁকে কংগ্রেস দল থেকে সাসপেন্ড করা হল, যাকে নেতাজি বললেন, 'কার্যত বহিষ্কার' করা হল। এর বিরুদ্ধতা করল না অবিভক্ত সিপিআই (যার মধ্যে আজকের সিপিএম ছিল)। এর কিছুদিন পর দক্ষিণপন্থীদের বিকল্প হিসাবে নেতাজি ভারতবর্ষের বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য তৎকালীন বিহারের রামগড়ে কনফারেন্স করলেন এবং সিপিআইকে এতে যোগদানের আহ্বান জানিয়ে বললেন, "একমাত্র এইভাবেই দক্ষিণপন্থীদের আক্রমণ ঠেকানো যেত এবং একটা মার্কসবাদী দল গড়ে ওঠার জমি প্রস্তুত করা যেত" (ক্রসরোডস)। কিন্তু সিপিআই নেতাজির আহ্বানে সাড়া না দিয়ে দক্ষিণপন্থী গান্ধীবাদীদের সাথে সহযোগিতা করে গেল।

মহান স্ট্যালিনের শিক্ষা অবিভক্ত সিপিআই সেদিন মানেনি

অথচ আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে কমিউনিস্টদের কী ভূমিকা হওয়া উচিত এ সম্পর্কে ১৯২৫ সালে মহান স্ট্যালিন গাইড লাইন হিসাবে বলেছিলেন, "ভারতের জাতীয় বুর্জোয়ারা আপসকামী ও বিপ্লবী পার্টিতে বিভক্ত হয়েছে এবং বুর্জোয়াদের আপসকামী অংশ ইতিমধ্যেই সাম্রাজ্যবাদের সাথে চুক্তি করেছে। এরা সাম্রাজ্যবাদের থেকেও বিপ্লবকে বেশি ভয় করে এবং দেশের স্বার্থের থেকেও মুনাফার স্বার্থকে বেশি গণ্য করে। বুর্জোয়াদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী ও প্রভাবশালী এই অংশ বিপ্লবের চরম শত্রুশিবিরে সম্পূর্ণভাবে

চলে গেছে এবং নিজ দেশের শ্রমিক ও কৃষকদের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের সাথে ব্লক গঠন করেছে, আপসকামী জাতীয় বুর্জোয়াদের বিচ্ছিন্ন করে গ্রাম ও শহরের পেটি বুর্জোয়াদের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য কমিউনিস্ট পার্টিকে বুর্জোয়াদের বিপ্লবী অংশের সাথে প্রকাশ্যে ব্লক গঠন করতে হবে" (স্ট্যালিন রচনাবলি, ৭ম খণ্ড)। স্ট্যালিনের এই মূল্যবান শিক্ষা অনুযায়ী সিপিআই-এর দায়িত্ব ছিল, আপসকামী দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে আপসহীন বিপ্লবী নেতাজিদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। কিন্তু ওরা বিপরীত কাজই করল। শুধু তাই নয়, ওরা ১৯৪২ সালের আগস্ট অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধতা করে ব্রিটিশদের সাথে সহযোগিতা করল এই যুক্তিতে যে ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে রাশিয়া-ইংল্যান্ড যখন মৈত্রী চুক্তি করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লড়ছে তখন ভারতে ব্রিটিশ শাসকদের সাথে সহযোগিতা করাই উচিত। অথচ সেই যুগের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম নেতা ডঃ রণেন সেন লিখেছেন, এর জন্য স্ট্যালিন সিপিআই নেতাদের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। আই এন এ-র লড়াই সম্পর্কেও সিপিআই একই আচরণ করেছিল। যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে নেতাজি জাপানের সহযোগিতায় আই এন এ বাহিনী গঠন করে দেশ স্বাধীন করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কৌশল হিসাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাপানকে ব্যবহার করা ঠিক ছিল কি না, এ নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। কিন্তু কখনও কি এ কথা ভাবা চলে, নেতাজি ব্রিটিশের পরিবর্তে ভারতবর্ষে জাপানি আধিপত্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিলেন! অথচ দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও ব্রিটিশের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে সিপিআই নেতাজির মতো দেশপ্রেমিককে 'জাপানের দালাল' আখ্যা দিল। শুধু তাই নয়, এই সিপিআই হিন্দু ও মুসলমান আলাদা জাতি এই তত্ত্ব খাড়া করে হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান গঠনও সমর্থন করল। এই ইতিহাস এখনকার সিপিআই, সিপিএম কর্মীরাও অনেকে জানেন না। জানলে হয়ত প্রশ্ন তুলতেন বা তোলা উচিত ছিল।

প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে লেনিনের শিক্ষাবলি সিপিআই গ্রহণ করেনি

এটা কি সিপিআইয়ের নেহাতই একটা ভুল ছিল! মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, এটা নিছক ভুল ছিল না। মার্কসবাদী বিজ্ঞানের আলোকে ওদের কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন যে, গোড়ার যুগে সিপিআই নেতাদের সততা, নিষ্ঠা, ত্যাগ থাকলেও তাঁরা দল গঠনে লেনিনীয় পদ্ধতি ও শিক্ষা অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ১৯০০ সালে 'ফাইট ফর দ্য ভ্যানগার্ড পার্টি' প্রবন্ধে মহান লেনিন রাশিয়ায় যথার্থ মার্কসবাদী দল গঠনে প্রাথমিক পর্বে কী করণীয় সেটা নির্দেশ করে লিখেছিলেন, "পার্টির প্রতিষ্ঠা করা ও তাকে

সংহত করার অর্থ হচ্ছে রুশ সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের (সে সময় মার্কসবাদীদের সোস্যাল ডেমোক্র্যাট বলা হত) মধ্যে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করা। এই ঐক্য ও সংহতি ডিক্রি জারি করে আনা যাবে না, কিংবা প্রতিনিধিদের সভায় প্রস্তাব-সিদ্ধান্ত পাশ করিয়েও আনা যাবে না। ঐক্য আনার জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু কাজ করতেই হবে। সর্বপ্রথমে, চিন্তার (ideas) ঐক্য আনা প্রয়োজন, যা রুশ সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে বর্তমানে যে মতপার্থক্য ও বিভ্রান্তি রয়েছে তা দূর করবে। ...অন্যথায় আমাদের ঐক্য হবে মেকি ঐক্য, যা বর্তমান বিভ্রান্তিগুলিকে আড়াল করবে ও সেগুলির সম্পূর্ণ অপসারণে বাধা দেবে" [To establish and consolidate the party means establishing and consolidating unity among all Russian social-democrats, and, for the reasons indicated above, such unity cannot be brought about by decree, it cannot be brought about by, let us say, a meeting of representatives passing a resolution. Definite work must be done to bring it about. In the first place, it is necessary to bring about unity of ideas which will remove the differences of opinion and confusion that – we will be frank– reign among Russian social-democrats at the present time. ... Otherwise our unity will be merely a fictitious unity, which will conceal the prevailing confusion and prevent its complete elimination.(What is to be Done)] আপনাদের এই প্রসঙ্গে বলতে চাই, লেনিন যে পার্টি গঠনের আগে ইউনিটি অফ আইডিয়াজ বা চিন্তার ঐক্য গড়ে তোলার সংগ্রামের উপর জোর দিয়েছিলেন, সেটা নিছক বিপ্লবের কর্মসূচি নির্ধারণ করা নয়, তিনি মার্কসবাদী দর্শনকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগের অপরিহার্য প্রয়োজনে মার্কসবাদের সঠিক উপলব্ধি, বিশেষ দেশের বিশেষ পরিস্থিতি অনুযায়ী মার্কসবাদের বিশেষীকরণ বা কংক্রিটাইজেশন, বুর্জোয়া সংস্কৃতির বিপরীতে কমিউনিস্ট সংস্কৃতির ধারণা গড়ে তোলা, যৌথ নেতৃত্ব ও গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণ গড়ে তোলা এই সামগ্রিক ক্ষেত্রে ইউনিটি অফ আইডিয়াজ গড়ার সংগ্রামের কথাই বুঝিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে আমাদের দল গঠনের পর্বে লেনিনের সুযোগ্য ছাত্র সৃজনশীল মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ লেনিনের এই ইউনিটি অফ আইডিয়াজ-এর সংগ্রামকে আরও সমৃদ্ধ করে দেখালেন, এটা হচ্ছে দলগঠনের আগে জীবনের সর্বদিক ব্যাপ্ত করে মার্কসবাদ প্রয়োগের মাধ্যমে আদর্শগত কেন্দ্রীকরণ গড়ে তোলার সংগ্রাম। তিনি দেখালেন, একমাত্র এই আদর্শগত কেন্দ্রীকরণের সংগ্রামের মাধ্যমেই দলে ব্যক্তিবাদ, ব্যক্তিনেতৃত্ব ও গ্রুপের অবসান ঘটিয়ে সর্বহারা গণতন্ত্র গড়ে তোলা যায় ; আদর্শগত কেন্দ্রীকরণের ভিত্তিতে সাংগঠনিক কেন্দ্রীকরণ, বুর্জোয়া ব্যক্তিনেতৃত্বের পরিবর্তে সর্বহারা যৌথ নেতৃত্ব

গড়ে ওঠে এবং এই যৌথ নেতৃত্ব গড়ে উঠেছে বলে তখনই বোঝা যায় যখন দলের সকল সদস্যের যৌথ জ্ঞান কোনও একজন নেতার মধ্য দিয়ে বিশেষীকৃত রূপ নেয়, দলে 'ওয়ান প্রসেস অফ থিঙ্কিং', 'ইউনিফর্মিটি অফ থিঙ্কিং', 'ওয়াননেস ইন অ্যাপ্রোচ' এবং 'সিঙ্গলনেস ইন পারপাস' গড়ে ওঠে। এটাই ব্যক্ত করে কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, "প্রথমত, যাঁরা দল গঠন করতে অগ্রণী হয়েছেন, তাঁদের নিজেদের মধ্যে প্রথমে চিন্তাজগতের সর্বক্ষেত্রকে ব্যাপ্ত করে, এমনকী ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি প্রতিটি দিককে জড়িত করে একটা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ভিত্তিতে গড়ে তুলে আদর্শগত কেন্দ্রীকরণের বুনিয়াদ স্থাপন করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, মনে রাখতে হবে, যৌথ নেতৃত্বের বাস্তব ও বিশেষীকৃত ধারণা গড়ে তোলার সংগ্রাম এক অর্থে পার্টি গড়ে তোলার প্রাথমিক সংগ্রাম। তাই চিন্তা জগতের সর্বক্ষেত্রকে ব্যাপ্ত করে আদর্শগত কেন্দ্রীকরণ অর্থাৎ সম চিন্তাপদ্ধতি, সম চিন্তা, সম বিচারধারা ও সম উদ্দেশ্যমুখিনতা গড়ে তুলতে না পারলে যৌথ নেতৃত্বের এই বাস্তবীকৃত ও বিশেষীকৃত ধারণাটি দলের মধ্যে গড়ে তোলাই সম্ভব নয় এবং যতদিন পর্যন্ত যাঁরা দল গঠন করতে অগ্রণী হয়েছেন, সেই সমস্ত নেতা ও কর্মীদের মধ্যে যৌথ নেতৃত্বের এই বিশেষীকৃত ধারণার জন্ম না হয়, মনে রাখতে হবে, ততদিন পর্যন্ত দলের চূড়ান্ত সাংগঠনিক রূপ দেওয়ার সময় আসেনি।

তৃতীয়ত, দলের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নেতা ও কর্মীদের এই নিরলস সংগ্রামের মধ্য দিয়েই যাঁরা দল গঠন করতে অগ্রণী হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে একদল 'প্রফেশনাল রেভোলিউশনারি' (জাত বিপ্লবী)-র জন্ম দিতে হবে। মার্কসবাদের পরিভাষায় এই প্রফেশনাল রেভোলিউশনারি বলতে, পয়সার বিনিময়ে হোলটাইম ওয়ার্কার বোঝায় না। ...প্রফেশনাল রেভোলিউশনারি হল শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রামী সচেতন অংশের সেই অংশ যাঁরা শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের সর্ব দিক ব্যাপ্ত করে একটা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী আদর্শকে এমনভাবে জীবনে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে যার ফলে ব্যক্তিগত জীবনের প্রয়োজন, নানাবিধ সুবিধা-অসুবিধা প্রভৃতির ঊর্ধ্বে উঠে নিঃসংশয়ে, নির্দ্বিধায় ও আনন্দের সাথে বিপ্লবী জীবনের সংগ্রামের বিভিন্ন জটিল প্রক্রিয়ায় তাঁরা সবসময়ই লিপ্ত থাকতে সক্ষম এবং সমস্ত ব্যাপারে, এমনকী ব্যক্তিগত ব্যাপারেও আনন্দের সাথে বিপ্লবের স্বার্থে পার্টির কাছে নির্দ্বিধায় 'সাবমিট' করতে সক্ষম। একমাত্র এই প্রফেশনাল রেভোলিউশনারিদের মধ্যে থেকেই যদি পার্টির নেতা ও নেতৃস্থানীয় কর্মীরা আসে তা হলেই একটি পার্টি সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টির যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। মূলত এই তিনটি প্রাথমিক শর্ত পূরণ হওয়ার পরেই কেবলমাত্র সম্মেলনের

মধ্য দিয়ে একটি কমিউনিস্ট পার্টির সংবিধানসম্মত সাংগঠনিক কাঠামোর জন্ম দেওয়া যেতে পারে" (কেন ভারতের মাটিতে এস ইউ সি আই (সি)একমাত্র সাম্যবাদী দল)।

লেনিনের উপরোক্ত শিক্ষাকে সিপিআই নেতারা দল গঠনে অনুসরণ করেননি। ভারতবর্ষের নানা জায়গার কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন কিছু গ্রুপকে রাতারাতি একত্র করে পার্টি গঠন করেছিলেন। মার্কসবাদকে ভিত্তি করে কোনও ইউনিটি অফ আইডিয়াজ গড়ে তোলার সংগ্রাম তাঁরা করলেন না। মার্কসবাদকে বিশেষীকৃত করতে ব্যর্থ হলেন, এবং মার্কসবাদকে জীবনদর্শন হিসাবে নেতা-কর্মীরা গ্রহণ করতে পারলেন না, কমিউনিস্ট সংস্কৃতিও গড়ে তুলতে পারলেন না। নেতাদের রাজনৈতিক জীবন ও ব্যক্তিগত জীবন আলাদা হয়ে রইল, দলে গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণের পরিবর্তে যান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণ গড়ে উঠল এবং প্রথম থেকেই নানা গ্রুপের অস্তিত্ব রয়ে গেল। রাশিয়ার পার্টিতে যেমন আদর্শগত সংগ্রামের মাধ্যমে যৌথ নেতৃত্বের ব্যক্তিকরণের বিশেষীকৃত রূপ বা অথরিটি হিসাবে প্রথমে লেনিন, পরে স্ট্যালিন, চীনের পার্টিতে যেমন মাও সে তুং এবং আমাদের দলে কমরেড শিবদাস ঘোষের অভ্যুত্থান ঘটতে পারল, সিপিআই ও পরবর্তীকালে সিপিএমে তা ঘটেনি। ফলে শুরু থেকেই সিপিআই এবং সিপিএম কমিউনিস্ট নামধারী পেটি বুর্জোয়া পার্টি হিসাবে গড়ে উঠল। এটা আপনারা মনে রাখবেন।

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতৃত্ব সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি

উল্লেখিত একই প্রবন্ধে, একটা বিশেষ দেশের মার্কসবাদী পার্টি অন্য দেশের মার্কসবাদী পার্টি থেকে কীভাবে শিক্ষা নেবে, সেই প্রসঙ্গে লেনিন বলেছিলেন, "একটা আন্দোলন তখনই শুধুমাত্র সাফল্য পেতে পারে, যখন তা অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতাকে আত্মস্থ করে। অভিজ্ঞতাকে আত্মস্থ করার জন্য শুধু তার সাথে নিছক পরিচিত থাকাই অথবা সর্বশেষ প্রস্তাবগুলি নকল করতে পারাই যথেষ্ট নয়। এই অভিজ্ঞতাকেও খুঁটিয়ে বিচার করতে পারা চাই, স্বাধীনভাবে সেই অভিজ্ঞতাকে যাচাই করে নিতে পারার যোগ্যতা থাকা চাই।" [A movement ... can be successful only on the condition that it assimilates the experience of other countries. In order to assimilate this experience, it is not sufficient merely to be acquainted with it, or simply to transcribe the latest resolutions. A critical attitude is required towards this experience, and ability to subject it to independent tests.(What is to be Done)] সিপিআই নেতারা কিন্তু আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব সম্পর্কে, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি, চীনের কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্নে লেনিনের শিক্ষাকে অনুসরণ না করে অন্ধের মতো মানতেন। পরে যখন সোভিয়েত ও চীনের

পার্টির মধ্যে মতভেদ দেখা দিল তখন সিপিআই নেতারা সোভিয়েত পার্টিকে এবং সিপিআই ভেঙে আলাদা হওয়ার পর সিপিএম নেতারা প্রথমদিকে চীনের পার্টিকে অন্ধের মতো মানতেন, পরে নকশালপন্থীরাও একইভাবে চীনের পার্টিকে অন্ধের মতো মানতেন। কিন্তু কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব ও অন্য দেশের কমিউনিস্ট পার্টিকে অন্ধের মতো মানা আন্তর্জাতিকতাবাদ নয়, যথার্থ আন্তর্জাতিকতাবাদ হচ্ছে সেই নেতৃত্বের সাথে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক স্থাপন করা, তার সিদ্ধান্তকে ক্রিটিক্যালি বিচার করা। তিনি নিজে স্ট্যালিন ও মাও সে তুংকে নেতা ও শিক্ষক হিসাবে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন এবং আমাদেরও দেখতে শিখিয়েছেন, আবার ১৯৪৮ সাল থেকেই তাঁদের নেতৃত্বের কিছু কিছু ত্রুটিও দেখিয়েছেন। বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের কিছু গুরুতর সমস্যা, সমাজতন্ত্রের কিছু কিছু জটিল সমস্যা এইসব বিভিন্ন সময়ে উল্লেখ করে এইসবের কারণ কি কি দেখিয়েছেন এবং সমাধানের পথও প্রদর্শন করেছিলেন একজন যথার্থ মার্কসবাদী চিন্তানায়ক ও আন্তর্জাতিকতাবাদী হিসাবে। যার ফলে যদিও সমাজতন্ত্র ও বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের বিপর্যয়ে আমরা খুবই ব্যথা পেয়েছি কিন্তু আমাদের দলে কোন হতাশা বা ভাঙন আসেনি। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় আমরা মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম।

লেনিন আরেকটি মূল্যবান শিক্ষায় বলেছিলেন, "আমরা মনে করি, রুশ সমাজতন্ত্রীদের জন্য স্বাধীনভাবে মার্কসীয় তত্ত্বের একটি বিশেষীকৃত বিশ্লেষণ অবশ্যই প্রয়োজন, কারণ, এই মার্কসীয় তত্ত্ব কেবল সাধারণ পথ-নির্দেশক নীতিগুলির সন্ধান দেয়, যা ইংল্যান্ডের বিশেষ ক্ষেত্রে যেভাবে প্রযোজ্য হবে, ফ্রান্সের ক্ষেত্রে তা হবে না, আবার ফ্রান্সের ক্ষেত্রে জার্মানির মতো হবে না, আবার জার্মানির বিশেষ পরিস্থিতিতে যেভাবে প্রযোজ্য হবে, রাশিয়ার ক্ষেত্রে তার থেকে ভিন্ন হবে।" [We think that an independent elaboration of the Marxist theory is especially essential for Russian socialist, for this theory provides only general guiding principles which in particular are applied in England differently from France, in France differently from Germany, and in Germany differently from Russia. (Left-wing communism — an infantile disorder)] সেজন্যই লেনিন শুধু মার্কস-এঙ্গেলসের পুস্তক রুশ ভাষায় অনুবাদ করে রাশিয়ায় বিপ্লব করেননি। তাঁকে রাশিয়ার মাটিতে খ্রিস্ট ধর্মের প্রভাব, সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারা, রুশ বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ, নারদনিক বাদ, টলস্টয়ের চিন্তার প্রভাব, রাশিয়ার তথাকথিত মার্কসবাদী মেনশেভিকদের বিরুদ্ধে মার্কসবাদী বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করে আদর্শগত সংগ্রাম করে রাশিয়াতে মার্কসবাদকে বিশেষীকৃত করতে হয়েছে, আবার দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের

সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রাম করতে হয়েছে, পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদী স্তরকে বিশ্লেষণ করে আন্তর্জাতিক গাইডলাইনও দিতে হয়েছে। মাও সে তুংও শুধু মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিনের বইগুলো চীনা ভাষায় ছাপিয়ে বিপ্লব করেননি। তিনিও চীনের সামন্ততান্ত্রিক চিন্তার প্রভাব, কনফুসিয়াসের দর্শনের প্রভাব, বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব, চীনের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের প্রভাবের বিরুদ্ধে লড়াই করে চীনের মাটিতে মার্কসবাদকে বিশেষীকৃত করেছেন। আমাদের দেশে সিপিআই নেতারা এইসব কিছুই করেননি, তাঁরা শুধু আন্তর্জাতিক নেতাদের বই ছাপিয়েই দায় সেরেছেন। একমাত্র কমরেড শিবদাস ঘোষই মার্কসবাদকে হাতিয়ার করে এ দেশের বেদ-বেদান্ত ইত্যাদি নানা ধর্মগ্রন্থের প্রভাব, বিবেকানন্দের চিন্তার প্রভাব, গান্ধীবাদের প্রভাব, রবীন্দ্রনাথের চিন্তার প্রভাব, বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ভাবধারার প্রভাব, বুর্জোয়া ও সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রভাব প্রভৃতির বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে এদেশের মাটিতে মার্কসবাদকে বিশেষীকৃত করেছেন। একই আলোচনায় লেনিন আরেকটি মূল্যবান কথাও বলেছিলেন, "আমরা মনে করি না মার্কসীয় তত্ত্ব এমন কিছু যা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে ও অলঙ্ঘনীয়। বরং আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, এই তত্ত্ব বিজ্ঞানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছে মাত্র, যাকে সর্বদিক দিয়ে আরও বিকশিত করার দায়িত্ব সমাজতন্ত্রীদের নিতে হবে যদি তারা জীবনের গতির সাথে মিলিয়ে চলতে চায়।" [We do not regard Marxist theory as something completed and inviolable; on the contrary, we are convinced that it has only laid the cornerstone of the science which socialists must further advance in all directions if they wish to keep pace with life. (Left-wing communism — an infantile disorder)] অর্থাৎ নিয়ত পরিবর্তনশীল চলমান জীবনে যে সব নতুন প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে, বুর্জোয়াদের নতুন আদর্শগত আক্রমণ ঘটছে, জ্ঞানবিজ্ঞান-দর্শন-রাজনীতি-অর্থনীতির ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা দেখা দিচ্ছে, মার্কসবাদী বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করে সেইসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে হবে, বুর্জোয়াদের আদর্শগত ক্ষেত্রে পরাস্ত করতে হবে। এইভাবে মার্কসবাদকে আরও সমৃদ্ধ ও উন্নত করতে হবে। এই দায়িত্ব লেনিন শিক্ষণীয়ভাবে পালন করেছেন। পরবর্তীকালে স্ট্যালিন ও মাও সে তুং মার্কসবাদকে সমৃদ্ধ করেছেন। আর করেছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ। তিনি লেনিন পরবর্তী সময়ে উদ্ভূত দর্শন-বিজ্ঞান-অর্থনীতি-রাজনীতি-সাহিত্য-সংস্কৃতির বহু সমস্যা ও প্রশ্নের মার্কসবাদসম্মত উত্তর দিয়ে মার্কসবাদকে সমৃদ্ধ ও উন্নত করেছেন। এক্ষেত্রেও সিপিআই নেতাদের কোনও ভূমিকা নেই। এতক্ষণ সিপিআই নিয়ে যা আলোচনা করলাম, সবটাই সিপিএম ও নকসালদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কারণ অবিভক্ত সিপিআই-এরই একটা অংশ সিপিএম এবং নকসালরা একই ঐতিহ্য বহন করে চলেছে।

কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছিলেন, রুশ বিপ্লবের সময় রাশিয়ায় পুঁজিবাদ ছিল খুবই দুর্বল। কৃষি ও সংস্কৃতির উপর ছিল সামন্ততন্ত্রের আধিপত্য। তাই বুর্জোয়া মানবতাবাদের একটা অঘোষিত প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল। চীনের বিপ্লবও ছিল গণতান্ত্রিক বিপ্লব সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে। ফলে দুই দেশেই 'বিপ্লবের স্বার্থ মুখ্য, ব্যক্তির স্বার্থ গৌণ' — এই ছিল কমিউনিস্ট চরিত্রের মাপকাঠি। কিন্তু তিনি দেখিয়েছিলেন, ভারত সহ উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে — যেখানে ব্যক্তিবাদ চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল রূপ ধারণ করেছে, আত্মকেন্দ্রিক, সমাজ সম্পর্কে উদাসীন মনোভাবের জন্ম দিয়েছে — সেখানে উপরোক্ত কমিউনিস্ট চারিত্রিক মানের দ্বারা বিপ্লব হবে না, এমনকী এই মানের দ্বারা বিপ্লব পরবর্তীকালের চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নেরও কাজ চলবে না, বরং তার পথে বাধা সৃষ্টি করবে। তাই সমস্ত উন্নত পুঁজিবাদী দেশ এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট চীনকে উপযুক্ত কমিউনিস্ট চরিত্রের মান অর্জন করতে হবে। ব্যক্তিকে শুধু ব্যক্তি সম্পত্তি পরিত্যাগ করলেই চলবে না, তাকে ব্যক্তি সম্পত্তিজাত মানসিক জটিলতা ও সংস্কৃতি থেকেও মুক্ত হতে হবে, তাকে নির্দ্বিধায় নিঃশর্তে আনন্দের সাথে শ্রমিক শ্রেণি, বিপ্লব ও বিপ্লবী দলের স্বার্থের সাথে নিজেকে একাত্ম করতে হবে।

আমি বলতে চাই, লেনিনের শিক্ষাকে এইভাবে অনুসরণ ও আয়ত্ত এবং সমৃদ্ধ করে উপরোক্ত প্রক্রিয়াতে কমরেড শিবদাস ঘোষ ১৯৪৮ সালের ২৪শে এপ্রিল ভারতের মাটিতে একমাত্র সাম্যবাদী দল হিসাবে এস ইউ সি আই (সি) দলের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

সিপিআই, সিপিএম ও নকশালপন্থীদের রাজনৈতিক লাইন ভ্রান্ত

এই প্রসঙ্গে আরেকটা কথাও বলতে চাই। লেনিন যখন ১৯১৭ সালের এপ্রিলে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আহ্বান দিয়েছিলেন, তখন রাশিয়ায় কৃষিতে সামন্ততন্ত্রের যথেষ্ট আধিপত্য ছিল, বিদেশি পুঁজিরও প্রভাব ছিল, পুঁজিবাদ খুবই অনুন্নত ছিল। তবুও যেহেতু ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে বুর্জোয়ারা রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, সেহেতু এপ্রিল থিসিসে লেনিন বললেন, 'to that extent bourgeois democratic revolution is completed'(April thesis) এবং যেহেতু রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ধারণই বিপ্লবের মূল প্রশ্ন, সেহেতু পরবর্তী বিপ্লবের স্তর হবে সমাজতান্ত্রিক এবং এই সমাজতন্ত্রই অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অপূরিত কাজ সম্পূর্ণ করবে। আর আমাদের দেশে সিপিএম-সিপিআই উভয়ই এ কথা মানে যে, ভারতবর্ষ একটি বুর্জোয়া স্বাধীন রাষ্ট্র, এখানে একচেটিয়া পুঁজিরও জন্ম হয়েছে, অথচ বিপ্লবের স্তর নির্ধারণ করতে গিয়ে সিপিএম বলে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব, সিপিআই বলে জাতীয় গণতান্ত্রিক

বিপ্লব। যা মূলত একই এবং উভয় ক্ষেত্রে বিপ্লবের শত্রু সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র এবং বিপ্লবের মিত্র প্রগতিশীল জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি, যেটা চীন বিপ্লবের ক্ষেত্রে ছিল। এ এক বিচিত্র বিপ্লবী তত্ত্ব নিয়ে চলছে এরা। রাষ্ট্রক্ষমতায় বুর্জোয়া শ্রেণি অধিষ্ঠিত, লেনিনের বিশ্লেষণ অনুযায়ী একচেটিয়া পুঁজি হচ্ছে পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর, তাহলে ভারতে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির প্রগতিশীল ভূমিকার কথা ওঠে কী করে? ভারতবর্ষের কৃষিতে পুরোপুরি পুঁজিবাদী নিয়ম প্রতিষ্ঠিত, প্রত্যন্ত গ্রামের শাকসব্জিও দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় বাজারের পণ্য হয়ে আছে, আঞ্চলিক বিচ্ছিন্ন বাজার বলে কিছু নেই এবং জমি, জমির উৎপাদন, গ্রামীণ শ্রমশক্তি সবই বাজারের পণ্য, কৃষিতে মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত, ফলে সামন্ততন্ত্রের ভূতের অস্তিত্বও কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। শুধু সংস্কৃতিতে বুর্জোয়ারা সামন্ততান্ত্রিক অবশেষ টিকিয়ে রেখেছে কিছু কিছু। ভারতীয় পুঁজিবাদ শুধু একচেটিয়া পুঁজি নয়, লগ্নি পুঁজির জন্ম দিয়েছে, মাল্টিন্যাশনালের জন্ম দিয়েছে, সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করে দক্ষিণ এশিয়ায় আধিপত্য বিস্তার করছে। এশিয়া, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ এবং এমনকী খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও ভারতীয় পুঁজিপতিরা পুঁজি বিনিয়োগ করছে, আবার এদেশেও বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ ডেকে আনছে। বিদেশি পুঁজি সবদেশেই বিনিয়োগ হচ্ছে। এই অবস্থায় ভারতের বিপ্লবের স্তরকে জনগণতান্ত্রিক বলা কি বাস্তবসম্মত? অথচ এই অবাস্তব তত্ত্বেরই দীর্ঘদিন তারা জাবর কেটে চলেছে। আর নকসালরা বলে ভারতবর্ষে বুর্জোয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি, একাজ বিপ্লবপূর্ববর্তী সামন্ততান্ত্রিক চীনের মতই শত্রু হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ত্রতন্ত্র এবং বিপ্লবের স্তর হচ্ছে জনগণতান্ত্রিক। আর কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, এই ভ্রান্ত তত্ত্বের অনিবার্য পরিণতি হিসাবে একদিকে সিপিএম-সিপিআই সংশোধনবাদ-সংস্কারবাদের চর্চা করছে, অন্যদিকে নকশালরা উগ্র বামপন্থার চর্চা করছে। প্রথমদিকে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির অন্ধ অনুকরণ ও তত্ত্বগত বিভ্রান্তি থেকে এই অদ্ভুত বিপ্লবী তত্ত্ব তারা দাঁড় করালেও পরবর্তীকালে সেটাই কর্মীদের বিভ্রান্ত করে নেতাদের রাজনৈতিক সুবিধাবাদ চর্চার সুযোগ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই সিপিএম-সিপিআই দুই পার্টিই ১৯৬৭-৬৮-৬৯ সালে সিন্ডিকেট কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ইন্দিরা কংগ্রেসকে প্রগতিশীল আখ্যা দিয়ে সমর্থন জানিয়েছে, জরুরি অবস্থার সময়ে ইন্দিরা গান্ধীর ২০ দফা কর্মসূচিকে সমর্থন করেছে, এমনকী ১৯৭৩-৭৪ সালে সমগ্র উত্তর-পশ্চিম ভারতে নানা গণতান্ত্রিক দাবিতে ছাত্র-যুবরা যখন আন্দোলনে নামল, যেটা পরবর্তীকালে জয়প্রকাশ নারায়ণের যোগদানের ফলে 'জে পি মুভমেন্ট' বলে পরিচিত হল, ওই আন্দোলনের বিরুদ্ধে সিপিআই সরাসরি ইন্দিরা কংগ্রেস সরকারকে সমর্থন করল, আর সিপিএম এই আন্দোলনে দক্ষিণপন্থীরা আছে এই অজুহাত তুলে পরোক্ষে ইন্দিরা গান্ধীকেই সাহায্য করল। আপনাদের জানা দরকার,

সেই সময় আমাদের দল বারবার সিপিএমকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে, দাবিগুলি গণতান্ত্রিক, ছাত্র-যুব-জনগণ ব্যাপকভাবে সামিল হয়েছে, আমরা বামপন্থীরা সম্মিলিতভাবে এই আন্দোলনে নেমে দক্ষিণপন্থীদের বিচ্ছিন্ন করে এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিই। কিন্তু ওরা কিছুতেই রাজি হল না। শুধু তাই নয়, এই ব্যাপারে আমরা সিপিএমের সমালোচনা করায় সিপিএম আমাদের শর্ত দিল, যুক্ত আন্দোলনে থাকতে হলে আদর্শগত সমালোচনা করা চলবে না। আমাদের দল বলল, যুক্ত আন্দোলনে মার্কসবাদ অনুসৃত নীতি হচ্ছে ঐক্য-সংগ্রাম-ঐক্য অর্থাৎ ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে ঐক্য, নানা প্রশ্নে পরস্পরের মধ্যে আদর্শগত সংগ্রাম — তার মাধ্যমে পারস্পরিক বোঝাপড়া উন্নত করে ঐক্যকে আরও সুদৃঢ় করা। ওরা এই নীতি মানতে অস্বীকার করল এবং আমাদের দলের সাথে ঐক্য ভেঙে দিল। এ কথাও আপনাদের বলতে চাই, সেদিন যদি সিপিএম আমাদের প্রস্তাব অনুযায়ী ইন্দিরা বিরোধী আন্দোলনে থাকত, তাহলে এই আন্দোলনকে একতরফা ব্যবহার করে সেদিনের জনসংঘ-আরএসএস এতটা শক্তিবৃদ্ধি করে আজকের জায়গায় আসতে পারত না, বিজেপি এতটা শক্তিশালী হতে পারত না। আবার দেখুন, যে দক্ষিণপন্থীরা আছে বলে সিপিএম নেতারা ইন্দিরা কংগ্রেস বিরোধী আন্দোলনে নামলেন না, সেই সি পি এমই আবার জরুরি অবস্থার পর ১৯৭৭ সালে নির্বাচনে জনসংঘ-আরএসএস সহ অন্যান্য দক্ষিণপন্থীরা মিলে যে জনতা পার্টি গঠন করেছিল, তার সাথে ঐক্য করে ভোটে নামলেন এবং পশ্চিমবাংলার বিধানসভা নির্বাচনেও জনতা পার্টির সাথে জোট করেই এগিয়েছিলেন, শেষপর্যন্ত আসন ভাগাভাগি নিয়ে দ্বন্দ্বের ফলে তা আর হয়ে ওঠেনি, কিন্তু কেন্দ্রের জনতা পার্টির সরকারকে সমর্থন করেছিলেন। এর পরের ইতিহাস আপনারা জানেন। কয়েকবার ইন্দিরা কংগ্রেসের 'স্বৈরতান্ত্রিকতা'র বিরুদ্ধে বিজেপির সাথে হাত মিলিয়েছে, আবার বিজেপির 'সাম্প্রদায়িকতা'র বিরুদ্ধে কংগ্রেসের সাথে হাত মিলিয়েছে। কংগ্রেসের সাথে হাত মিলিয়ে ইউপিএ সরকার গঠন করেছে। এই সবটাই করেছে নিছক ভোটে ফয়দা তোলার স্বার্থেই।

সিপিএমের বর্তমান পরিণতির কারণ কী

তারপর দেখুন, সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই অবিভক্ত বাংলা ও পরবর্তীকালের পশ্চিমবঙ্গ বামপন্থী আন্দোলনের পীঠস্থান ছিল। একদিকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র সহ বিপ্লববাদের প্রভাব, অন্যদিকে শক্তিশালী আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রভাবের ফলেই এটা হয়েছিল। যার জন্য ব্রিটিশ শাসকরা বাংলাকে আতঙ্কের চোখে দেখত। ভারতের বুর্জোয়ারাও আতঙ্ক হিসাবে দেখত। নেহেরু তো বলেই ছিলেন, কলকাতা দুঃস্বপ্নের নগরী, মিছিল নগরী। গত শতাব্দীর পাঁচের দশক

থেকে শুরু করে ছয়ের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এ রাজ্যে বামপন্থী আন্দোলনের জোয়ার ছিল। জনগণ বামপন্থাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত। এটা প্রথমদিকে সিপিআই ও পরে সিপিএম তাদের দলের শক্তিবৃদ্ধিতে কাজে লাগিয়েছিল। আর এখন ৩৪ বছর সিপিএমের নেতৃত্বে বামফ্রন্টের শাসনে এমন হাল হয়েছে যে বামপন্থা কলঙ্কিত হয়েছে। লোকে এখন বামপন্থা ও সিপিএমের থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। কমিউনিজম ও বামপন্থার মর্যাদা যতটুকু আছে আমাদের দলই ধরে রেখেছে। ভেবে দেখুন, কেন এমন পরিস্থিতি হল ! পাঁচ ও ছয়ের দশকে যতক্ষণ বিরোধী দল হিসাবে ওরা আন্দোলনে ছিল, আমরাও সাথে ছিলাম। আন্দোলনের লক্ষ্য, স্লোগান, কায়দা, কলাকৌশল নিয়ে আমাদের বিপ্লবী লাইনের সাথে ওদের সংস্কারবাদী লাইনের দ্বন্দ্ব হত, তা সত্ত্বেও সংগ্রামে ওদের একটা ভূমিকা থাকত। কিন্তু পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে থাকল ১৯৬৭-৬৯ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার যখন গঠিত হল এবং ওরা সরকারি ক্ষমতার স্বাদ পেল। লেনিন জনগণকে বুর্জোয়া পার্লামেন্ট সম্পর্কে মোহমুক্ত করে বিপ্লবের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কমিউনিস্টদের পার্লামেন্টের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে বলেছিলেন, কিন্তু সরকার গঠনের সুযোগ এলে কীভাবে সরকার চালাবে, এ সম্ভাবনা তিনি দেখে যাননি। ফলে কিছু বলে যাননি। এই কাজ করেছিলেন, তাঁর সুযোগ্য ছাত্র কমরেড শিবদাস ঘোষ। তিনি ১৯৬৭ সালে বলেছিলেন, (১) দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন, (২) গরিব মানুষের স্বার্থে সবচেয়ে বেশি সরকারি অর্থব্যয় ছাড়াও (৩) প্রধান লক্ষ্য হবে শ্রেণিসংগ্রাম ও গণআন্দোলনকে উৎসাহিত করা ও তীব্রতর করা এবং ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে পুলিশি আক্রমণ থেকে মুক্ত রাখা। এর জন্য প্রয়োজনে বুর্জোয়া রাষ্ট্র ও কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে সংঘাতে যাওয়া এবং তাদের চরিত্র উন্মোচিত করে দেওয়া। তাঁর এই প্রস্তাব সিপিএম সহ কোনও দলই মানতে চায়নি ল অ্যান্ড অর্ডার রক্ষার নাম করে। কমরেড শিবদাস ঘোষ বললেন, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে এই ল অ্যান্ড অর্ডার তো বুর্জোয়া শ্রেণির স্বার্থ রক্ষার জন্য, জনগণের স্বার্থে নয়। আন্দোলন ন্যায়সঙ্গত কি না — এটা দেখতে হবে, আইনের প্রশ্ন এখানে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে না। আমাদের অনেক চাপাচাপিতে ওরা মানতে বাধ্য হলেও মন থেকে মানল না। ১৯৬৭ সালে আমাদের দলের প্রথম সারির নেতা কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী শ্রমমন্ত্রী ছিলেন। তিনি যুক্তফ্রন্ট সরকারের নীতি হিসাবে ঘোষণা করলেন, 'ন্যায়সঙ্গত গণআন্দোলনে পুলিশ হস্তক্ষেপ করবে না।' পশ্চিমবঙ্গে গণআন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি হল। স্লোগান উঠেছিল, 'যুক্তফ্রন্ট সরকার সংগ্রামের হাতিয়ার'। সমগ্র ভারতে বিরাট উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছিল। অন্যদিকে পুঁজিপতিরা আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। এই পুঁজিপতিদের তুষ্ট করার জন্য ১৯৬৯ সালে শ্রমমন্ত্রীত্ব থেকে আমাদের দলকে সিপিএম ও অন্যরা সরিয়ে দেয়। এরপরের ইতিহাস আপনারা জানেন। ১৯৭৭

সাল থেকে দেশি-বিদেশি পুঁজিকে তুষ্ট করার জন্য ৩৪ বছরের শাসনে ওরা বামফ্রন্ট সরকারকে শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রাম ও গণআন্দোলন ভাঙার হাতিয়ারে পরিণত করেছে। এ ছাড়া পুলিশ-প্রশাসনে, শিক্ষায়তনে দলীয় আধিপত্য কায়েম, স্বজনপোষণ, দুর্নীতি, অ্যান্টিসোস্যালদের দিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি, বিরোধীদের কণ্ঠরোধ, ভোটে রিগিং ইত্যাদিও তো আপনারা প্রত্যক্ষ করেছেন। এ সবই ঘটেছে সিপিএমের গদিসর্বস্ব রাজনীতির ফলে। দলের মধ্যে অতীতে ওদের মতো করে মার্কসবাদ, বামপন্থা, বিপ্লব প্রভৃতির চর্চা যতটুকু হত, সেগুলি প্রায় উঠে গিয়ে অবস্থা এমন হয়েছে সরকারি ক্ষমতাচ্যুত হয়ে তারা আজ প্রায় ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েছে। দলের নেতারা হাজার চেষ্টা করেও কর্মীদের চাঙ্গা করতে পারছেন না। আজ এমনই দুরবস্থা! এ সবই তাদের মার্কসবাদবিরোধী সংশোধনবাদী-সংস্কারবাদী রাজনীতির অনিবার্য পরিণতি।

এতক্ষণ ধরে এই বিষয়টা আলোচনা করলাম এইজন্য যে আমাদের নেতৃবৃন্দ জানিয়েছেন আজকের এই সভায় বহু সিপিএম কর্মী-সমর্থক এসেছেন আমাদের বক্তব্য শোনার জন্য। তাঁদের বলতে চাই যে, সিপিএম সম্পর্কে বা কোনও দল সম্পর্কে আমাদের কোনও বিদ্বেষ নেই। আমরা কুৎসা রটনার রাজনীতি করি না। আদর্শগত পার্থক্য আলোচনা করি। তাঁদের নেতারা আমাদের বক্তব্য ভুল মনে করলে বলতে পারেন, আমরা সংশোধন করে নেব। সিপিএম কর্মী-সমর্থকদের বলব, হতাশ হবেন না। ভুল থেকে শিক্ষা নিন। 'কমিউনিস্ট', 'মার্কসবাদী' এইসব লেবেল দেখে দলের পিছনে ছুটবেন না। দ্বিতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের নেতা ছিলেন স্বয়ং মহান এঙ্গেলস, তাঁর মৃত্যুর পর এই আন্তর্জাতিকের যখন সংশোধনবাদী অধঃপতন হয়, লেনিন তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তৃতীয় আন্তর্জাতিক গঠন করলেন। রাশিয়ায় আরএসডিএলপি, মেনশেভিকরাও নিজেদের মার্কসবাদী বলে দাবি করত, লেনিন কেন আলাদা মার্কসবাদী বলশেভিক পার্টি গঠন করলেন? এইগুলি থেকে শিক্ষা নিন। অন্ধের মতো কাউকে মেনে চলা মার্কসবাদ নয়, দীর্ঘদিন যুক্ত আছেন বলেই দল মার্কসবাদবিরোধী পথে চলছে জেনেও দুর্বলতা কাটাতে পারছেন না, এটা বিপ্লবী চরিত্র নয়। এই কথাগুলি আপনারা ভেবে দেখবেন।

এস ইউ সি আই (সি) ঐক্য চায় আন্দোলনের স্বার্থে, ভোটের জন্য নয়

এ কথা ঠিক, ২০০৯-এর লোকসভা ও ২০১১-এর বিধানসভা নির্বাচনে আমাদের দল শুধুমাত্র সিপিএমকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য তৃণমূলকে সমর্থন করেছিল। এর আগে সিপিএম সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের দল প্রাথমিকে ইংরেজি পুনঃপ্রবর্তন সহ বহু দাবিতে লড়াই করেছে। আমাদের বহু কর্মীর রক্ত ঝরেছে, দেড়

শতাধিক কর্মী খুন হয়েছেন, মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে ৫০ জনকে যাবজ্জীবন দণ্ডাদেশ করিয়েছে সিপিএম। তা সত্ত্বেও কিন্তু আমাদের দল সিপিএম সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার ডাক দেয়নি। কিন্তু নন্দীগ্রামে ও সিঙ্গুরে যখন কৃষক আন্দোলন দমনে পুলিশ ও ক্রিমিনাল দিয়ে গণহত্যা ও গণধর্ষণ করাল, এই ফ্যাসিস্টিক অত্যাচার দেখে আমরা বুঝলাম ওরা আবারও ক্ষমতায় থাকলে গণআন্দোলন দমনে এই অত্যাচার আরও বাড়বে। নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুরে আন্দোলন আমরাই শুরু করি, তৃণমূল নয়। এ কথা সব দলের নেতারা, প্রশাসন, সাংবাদিকরা এবং বিশেষভাবে সেখানকার জনগণ জানেন। কিন্তু সংবাদমাধ্যম যেমন আমাদের কোনও খবর দেয় না, এই খবরও দেয়নি। তৃণমূল যখন এই আন্দোলনে নামতে চায়, আমরা রাজি হই, কারণ একা আমরা সিপিএমের আক্রমণ রুখতে পারব না। তাই তৃণমূলকে নিয়ে নিচুতলায় পাবলিক কমিটি গড়ে তুলি। অবশ্য তৃণমূল সিঙ্গুর আন্দোলনের সর্বনাশ করল। আমাদের দলের উদ্যোগে ওখানকার চাষিরা দুইদিন পুলিশের সাথে লড়াই করে জমি দখলে রেখেছিল, কিন্তু তৃণমূল নেত্রী কলকাতায় অনশনে বসে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিলেন, ওখানকার চাষিদের বোঝালেন অনশনেই কাজ হবে। এভাবে সিঙ্গুর আন্দোলন থামিয়ে দিলেন। সেই সুযোগে সরকার জমি দখল করে নিল। কিন্তু নন্দীগ্রামে এটা পারেনি। কারণ ওখানকার স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব আমাদের প্রস্তাব অনুযায়ী একত্রে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। কিন্তু সংবাদমাধ্যম প্রচার করল এমনভাবে যেন নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুর আন্দোলন তৃণমূলই করেছে। ইতিপূর্বে তৃণমূলের তরফ থেকে আমাদের কাছে ভোটে ঐক্যের প্রস্তাব আসা সত্ত্বেও আমরা রাজি হইনি। যেমন ২০০১ সালে সিপিএমও আমাদের ভোটে ঐক্যের প্রস্তাব দিয়েছিল। আমরা রাজি হইনি। কারণ এমএলএ, এমপি-র লোভে আমরা ঐক্যে যাই না। আমরা যাই নীতির ভিত্তিতে, গণআন্দোলনের প্রয়োজনে। তৃণমূলের সাথে আমরা ঐক্যে গিয়েছি (১) গণআন্দোলনের স্বার্থে সিপিএমকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য, (২) নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সাফল্য যাতে তৃণমূল আত্মসাৎ করতে না পারে, (৩) তৃণমূল যাতে ভোটের প্রচারে মার্কসবাদ ও বামপন্থাকে আক্রমণ করতে না পারে, (৪) তৃণমূল বিরোধীপক্ষে থাকায় প্রচারমাধ্যম তার সম্পর্কে যে মোহ সৃষ্টি করছিল, সরকারি গদিতে বসলে তার আসল চেহারা জনগণ বুঝতে পারবে। যেমন এখন হাড়ে হাড়ে বুঝছে। এইসব কারণেই আমরা তৃণমূলের সঙ্গে ঐক্যে গিয়েছি। আমরা ভোটের আগেই বলেছিলাম, তৃণমূল সরকারি গদিতে বসলেই আমরা রাস্তায় আন্দোলনে নামব এবং আমরাই প্রথম তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছি। আমাদের মন্ত্রীত্বের অফার দিয়েছিল তৃণমূল, সেটাও প্রত্যাখ্যান করেছি। আবার আপনারা এটাও লক্ষ করেছেন, সম্প্রতি আমাদের দলের সাথে সিপিএমের ইস্যুভিত্তিক ঐক্য গড়ে উঠেছে। এখানে বলা দরকার, ১৯৫২

সালে ফরওয়ার্ড ব্লক, আরএসপি, আরসিপিআই শক্তিশালী বামপন্থী দল ছিল। কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনে সিপিআই-এর ভূমিকার জন্য, তারা সিপিআইকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত করতে চাইছিল না। আমাদের দলের চেষ্টাতেই সিপিআইকে যুক্ত করা হয়। এরপর থেকে দীর্ঘদিন প্রথমে সিপিআই ও পরে সিপিএম, সিপিআই-এর সাথে আমাদের ঐক্য ছিল। কিন্তু ওরাই ১৯৭৪ সালে সেই ঐক্য ভেঙে দেয়, যেকথা আগেই বলেছি। এমনকী পশ্চিমবঙ্গে ও কেরালায় সিপিএম সরকারের বিরুদ্ধে আমরা যখন আন্দোলন করছিলাম, আমাদের নেতা- কর্মীরা ওদের হাতে যখন মার খাচ্ছিলেন, খুন হচ্ছিলেন, তখনও আমাদের দল সর্বভারতীয় স্তরে ও অন্যান্য রাজ্যে ওদের সাথে কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ঐক্য চেয়েছিল। কিন্তু ওরা শর্ত দিল, পশ্চিমবঙ্গে ও কেরালায় ওদের সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন বন্ধ না করলে সর্বভারতীয় স্তরে ঐক্য হবে না। আমরা রাজি হইনি। এবার সিপিএম-এর সাধারণ সম্পাদক কলকাতায় এসে আমাদের সাথে দেখা করে ঐক্যের প্রস্তাব দেন। আমরা রাজি হই এবং সকল বক্তব্য খোলাখুলি রাখি। এর সবটাই পুস্তিকাকারে প্রকাশ পেয়েছে। তাছাড়া এবার সিপিআই এবং সিপিএম-এর পার্টি কংগ্রেসে আমন্ত্রিত হয়ে আমি অন্যান্য বক্তব্যের সাথে খোলাখুলি বলেছি, আমরা বামপন্থী ঐক্য চাই ভোটের সুবিধার জন্য নয়, একমাত্র শ্রমিকশ্রেণির সংগ্রাম ও গণআন্দোলন তীব্রতর করার জন্য। মনে রাখবেন, আমাদের দল বিপ্লবী দল, আমাদের কাছে মন্ত্রীত্ব, এমএলএ, এমপি অতি তুচ্ছ বিষয়। বিপ্লবী লক্ষ্য নিয়ে আমরা শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রাম ও গণআন্দোলন গড়ে তুলি, একই লক্ষ্য নিয়ে ভোটেও লড়ি। আমাদের কাছে ১০০ জন এমপি-র থেকে একজন ক্ষুদিরাম বা ভগৎ সিং চরিত্র অনেক মূল্যবান। কমরেড শিবদাস ঘোষ দলের কর্মীদের বিপ্লবী চরিত্র গড়ে তোলার ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দিয়ে গেছেন। তাঁর শিক্ষায় আমাদের দলে চরিত্র গঠনের সংগ্রাম চলে। তিনি লেনিনের শিক্ষাকে উল্লেখ করে বলেছেন, বেটার ফিউয়ার, বাট বেটার (সংখ্যায় অল্প হোক, কিন্তু খাঁটি চাই)। তিনি আমাদের অতীতের মনীষী ও বিপ্লবীদের জীবনসংগ্রাম থেকে শিক্ষা নিয়ে আরও এগিয়ে যেতে বলেছেন উন্নততর কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জনের জন্য। আমাদের দলের ছেলেমেয়েদের দেখে যে আপনাদের ভাল লাগে তার কারণ রয়েছে এখানেই।

ভারত সহ সমগ্র বিশ্বে পুঁজিবাদ আজ চরম সংকটে

আপনাদের বলতে চাই, এই সব সরকারি দল 'উন্নয়ন', 'দুর্নীতি দূরীকরণ', 'পরিবর্তন' — এইসব স্লোগানে বারবার আপনাদের ঠকাচ্ছে এবং আপনারাও ঠকছেন। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে কার উন্নয়ন হচ্ছে? মালিকের না শ্রমিকের,

শোষকের না শোষিতের — এই প্রশ্ন বিচার করতে হবে। কোনও সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশেই আজ শ্রমিকশ্রেণির, শোষিত জনগণের জীবনে উন্নয়ন নেই, বরং সংকট তীব্রতর হচ্ছে। সমগ্র বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী অর্থনীতি দীর্ঘদিন ধরে মন্দার সংকটে ধুঁকছে। এর থেকে তার বেরোবার রাস্তা নেই। পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতির বাজার নেই, মানে বাজারে খরিদ্দার নেই। সমগ্র বিশ্বে ৬০০ কোটি মানুষের মধ্যে ২০০ কোটি ২০ লক্ষ হচ্ছে বেকার। ৩৩০ কোটি মানুষের দৈনিক রোজগার মাত্র ১৭৮ টাকা ৪৬ পয়সা। এটা ওদেরই হিসাব। আমাদের দেশে ১২১ কোটি মানুষের মধ্যে রাষ্ট্রপতির স্বীকৃতি অনুযায়ী ৬৬ কোটি বেকার। সরকারি কমিশনের হিসাব অনুযায়ী ৭৮ শতাংশ মানুষ দৈনিক ২০ টাকাও ব্যয় করতে পারেনা।

ফলে এই অবস্থায় বাজারের অবস্থা কী হতে পারে! মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, জাপান, সবাই তীব্র বাজারসংকট ও মন্দায় আক্রান্ত। ফলে কলকারখানায় ক্লোজার, লকআউট, শ্রমিক ছাঁটাই চলছেই। মুনাফার উদ্দেশ্যে পরিচালিত পুঁজিবাদী অর্থনীতি যে অনিবার্যভাবে এই সংকটে পড়বে, বহুদিন আগেই মহান মার্কস ও এঙ্গেলস তা দেখিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন, পুঁজিপতিরা পুঁজি বিনিয়োগ করে মুনাফার জন্য, আর সেই মুনাফা আসে আনপেইড সারপ্লাস লেবার থেকে, অর্থাৎ শ্রমিককে তার ন্যায্য প্রাপ্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করে সারপ্লাস ভ্যালু আসে, সেখান থেকেই পুঁজিপতিরা মুনাফা করে। ফলে ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত জনগণই বাজারের অধিকাংশ ক্রেতা, তাদের প্রয়োজন থাকলেও তারা কিনতে পারে না। এখান থেকেই আসে বাজারসংকট। স্ট্যালিন দেখিয়েছেন, আজকের দিনের একচেটিয়া পুঁজির চাই সর্বোচ্চ মুনাফা এবং তারই প্রয়োজনে সর্বোচ্চ শোষণ চলছে। মার্কসের সময় পুঁজিবাদের যে স্তর ছিল, সেটা দেখিয়ে মার্কস বলেছিলেন, পুঁজিপতিরা শ্রমিককে সেই মজুরি দেয় যাতে শ্রমিক জীবনধারণ করে পরিশ্রম করতে পারে এবং তার বংশধর পরবর্তী শ্রমিককেও বাঁচাতে পারে। এখন আর পুঁজিবাদের সেই প্রয়োজন নেই। ফলে নিড-বেসড (প্রয়োজনভিত্তিক) ওয়েজ নেই। কারণ বাজারে অঢেল বেকার ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার সুযোগ নিয়ে অতি সস্তা মজুরি দিয়ে ৮ ঘন্টার পরিবর্তে ১০/১২ ঘন্টা কাজ করাচ্ছে, ঠিকা শ্রমিকের উপরই জোর দিচ্ছে। এই অবস্থা চলছে সমগ্র পুঁজিবাদী দুনিয়ায় ও আমাদের দেশে। তাই বাজারসংকট আরও তীব্র হচ্ছে। আগে ছিল ডিমান্ডভিত্তিক অর্থাৎ চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন, এখন কৃত্রিমভাবে বাজার সৃষ্টির জন্য ঋণ দিচ্ছে অর্থাৎ ব্যাঙ্ক ধার দিচ্ছে পণ্য কেনার জন্য, কিন্তু তাতেও সংকট বাড়ছে। ঋণ যারা পাচ্ছে, ব্যাঙ্কের আসল তো দূরের কথা, তারা সুদও দিতে পারছে না। গ্রামে শহরে কোটি কোটি ক্ষুধার্ত কর্মহীন মানুষের সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়ছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতি বছর আমাদের

দেশেই অনাহারে-বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে, আরও কয়েক লক্ষ অভাব ও দেনার জ্বালায় আত্মহত্যা করছে। লক্ষ লক্ষ মেয়েরা দেহ বিক্রির বাজারে পণ্য হয়ে যাচ্ছে। এই তো 'উন্নয়ন' হচ্ছে। আবার উন্নয়ন কি কারও হচ্ছে না? রাষ্ট্রসংঘের হিসাব অনুযায়ী সমগ্র বিশ্বের ৩৫০ কোটি মানুষের যা সম্পদ, মাত্র ৮৫ জন মালিক সেই সমপরিমাণ সম্পদের অধিকারী। আমাদের দেশও কোটিপতির সংখ্যায় বিশ্বে পঞ্চম স্থান অধিকার করেছে। এদেশে কোটিপতির সংখ্যা বাড়ছে, এমনকী পার্লামেন্টে যারা জনপ্রতিনিধি বলে পরিচিত তাদের মধ্যে ৮০ শতাংশ কোটিপতি। একবার ভেবে দেখুন এরা কোন জনগণের প্রতিনিধি! ফলে এদের জীবনেই উন্নয়ন হচ্ছে।

আর যারা দুর্নীতি দূরীকরণের আওয়াজ তুলছে তারা নিজেরাই তো চরম দুর্নীতিগ্রস্ত। এক দলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে আরেক দল গদিতে বসে আগে সরকারে যারা ছিল, দুর্নীতিতে তাদেরও ছাপিয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্রে কংগ্রেস ও বিজেপি তাই করছে, অন্য রাজ্যে সরকারি দলগুলিও তাই করছে। পশ্চিমবঙ্গেও সিপিএম সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে হুংকার দিয়ে তৃণমূল ক্ষমতায় এসে এখন তাদেরও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এর কারণ কী? সমগ্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থা চরম অমানবিক, মূল্যবোধহীন ও দুর্নীতিগ্রস্ত, পুঁজিবাদের সেবাদাস রাজনৈতিক দলগুলিরও একই অবস্থা। পুঁজিপতিদের যেমন একমাত্র লক্ষ্য যেভাবেই হোক শোষণ-মুনাফা বাড়াতে হবে, মানুষ মরল কি বাঁচল দেখার দরকার নেই; এই দলগুলির নেতাদেরও একমাত্র লক্ষ্য হল যেভাবেই হোক, মন্ত্রীত্বের গদি দখল আর লুটেপুটে টাকা কামানো, দেশ বা জনগণের স্বার্থ বলে কিছু নেই। স্বদেশি আন্দোলনের যুগে রাজনীতি ছিল দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করা, আর এখন দাঁড়িয়েছে কে কত ধনদৌলত কামাতে পারে, ভোগবিলাসে মত্ত থাকতে পারে। এদের কাছ থেকে আপনারা কী আশা করতে পারেন! এরা ভণ্ড, প্রতারক।

আর 'পরিবর্তন'-এর নামে এদেরই এক দলের জায়গায় আরেক দল সরকারি গদিতে বসছে পুঁজিপতিশ্রেণির আশীর্বাদে। আপনাদের জীবনের কোনও পরিবর্তন হচ্ছে কি? সংকটজর্জরিত জীবনের কোনও পরিবর্তন হচ্ছে কি? কিছুই হচ্ছে না বরং সংকট আরও বাড়ছে। এ অবস্থায় অতি দুঃখে একদল মানুষ বলেন, এরা ধান্দাবাজ, ঠকায়। কিন্তু এরা ঠকাতে পারছে কেন? বারবার আপনারা ঠকছেন কেন? ভেবে দেখেছেন কি? কারণ আপনারা রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না। বলেন, 'আমরা অতশত বুঝি না। আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খবর নিয়ে কী করব'? আর এজন্যই বারবার ঠকছেন। যে রাজনীতির ওপর আপনাদের খাওয়া-পরা, চাকরি-বাকরি, ঘর-সংসার, জীবনের নিরাপত্তা সবকিছু নির্ভরশীল, সেই রাজনীতি থেকে আপনারা দূরে থাকেন। আর বুর্জোয়া শ্রেণি ও এইসব ধুরন্ধর নেতারা সেই সুযোগ নিয়ে বারবার আপনাদের বোকা বানিয়ে ঠকায়। সেই স্বদেশি

আন্দোলন থেকেই এই জিনিস চলছে। তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ও ভারতীয় পুঁজিপতিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যম বিপ্লবীদের প্রচার দিত না বরং অপপ্রচার করত — ওরা খুনি-ডাকাত-সন্ত্রাসবাদী। সুভাষচন্দ্রের বক্তব্যেরও প্রচার দেয়নি। অন্যদিকে গান্ধীজিকে অবতার বানিয়েছিল। দেশের মানুষও অন্ধের মতো তাই বিশ্বাস করেছিল। আজ তার ফল ভুগতে হচ্ছে। পরবর্তীকালে বুর্জোয়া প্রচারমাধ্যম কংগ্রেস নেত্রীকে 'এশিয়ার মুক্তিসূর্য' বানিয়েছিল, তাঁর 'গরিবি হঠাও', কংগ্রেসের 'দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচি', প্রথম বিজেপি সরকারের 'সুদিন', 'আলাদা ধরনের দল' (পার্টি উইথ ডিফারেন্স), বর্তমান বিজেপি'র 'আচ্ছে দিন', '১০০ দিনের মধ্যে কালো টাকা উদ্ধার করে প্রত্যেক ঘরে ১৫ লক্ষ টাকা দেওয়া', সিপিএমের 'গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা', 'শিল্পায়নের ব্র্যান্ড', তৃণমূলের 'অগ্নিকন্যা', 'সততার প্রতীক' ইত্যাদি কত দলের কত প্রচার এইসব বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যম করেছে। আর আপনারা বিভ্রান্ত হয়ে তার পিছনে ছুটেছেন। তারপর মার খাচ্ছেন। এভাবে আর কতদিন চলতে দেবেন? যদি সংকটের হাত থেকে বাঁচতে চান, যথার্থ পরিবর্তন চান, তাহলে রাজনীতি বুঝুন, খবরের কাগজ আর টিভির প্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না, ভিড় দেখে ছুটবেন না, যথার্থ দল চিনে নিন। একবার লক্ষ করুন, ব্রিটিশ শাসনের যুগে যেমন বিপ্লবীদের ও নেতাজিদের সংবাদ খবরের কাগজ, রেডিও প্রচার করত না, তেমনি আজও সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রতিষ্ঠিত এস ইউ সি আই (সি)-র প্রচারও সংবাদমাধ্যম দেয় না। আজ যে এতবড় সমাবেশ হয়েছে, দেখবেন কালকে খবরের কাগজে, টিভিতে এর কোনও খবর থাকবে না। কারণ সেদিন যেমন ওরা বিপ্লবীদের, নেতাজিদের ভয় করত, আজ তেমনি একমাত্র সর্বহারা শ্রেণির বিপ্লবী দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-কে ভয় পায়। কিন্তু এভাবে আমাদের অগ্রগতি আটকাতে পেরেছে কি? ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর কতদিন আমাদেরও সিপিআই, সিপিএম, আরএসপি, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং কংগ্রেস ব্যঙ্গবিদ্রুপ করেছে। বলেছে ওটা পার্টি নয়, একটা ক্লাব। বলেছে, চামচিকেও পাখি আর এস ইউ সি আই-ও পার্টি। আজ সেই পার্টি কোনও সংবাদমাধ্যমের ব্যাকিং ছাড়া, এমএলএ-এমপি-র জোর ছাড়াই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের অপরাজেয় চিন্তাধারাকে হাতিয়ার করে ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। হাজারে হাজারে শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুবক-মহিলা এই দলের পতাকাতলে সামিল হচ্ছে, বিদেশেও কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার প্রভাব পড়ছে, এই চিন্তায় বাংলাদেশে বিপ্লবী দল গড়ে উঠছে। আপনাদের বুঝতে হবে, যথার্থ পরিবর্তন ঘটাতে হলে সরকার পরিবর্তন নয়, চাই শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রের পরিবর্তন, চাই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। এই আহ্বানই ১৯৪৮ সালে ২৪ এপ্রিল কমরেড শিবদাস ঘোষ দিয়েছিলেন।

পুঁজিবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবই যথার্থ পরিবর্তনের একমাত্র পথ

মনে রাখবেন, ফাঁকি দিয়ে এ কাজ হবে না। পুঁজিবাদ থাকবে মানে বেকারি, ছাঁটাই, দারিদ্র, অনাহারে মৃত্যু, ভিক্ষাবৃত্তি, নারীদেহ বিক্রি, শিশু-বৃদ্ধা নির্বিশেষে নারীধর্ষণ, মনুষ্যত্বের সংকট, মূল্যবোধহীনতা, স্নেহ-মমতা-ভালোবাসার মৃত্যু ইত্যাদি বাড়তেই থাকবে। এই পরিস্থিতির স্থায়ী অবসান করতে হলে চাই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। যেমন সোভিয়েত সমাজতন্ত্র এর স্থায়ী অবসান ঘটিয়ে নতুন সভ্যতা সৃষ্টি করেছিল, যে সভ্যতাকে দেখে বিগত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মনীষী রম্যাঁ রল্যাঁ, বার্নার্ড শ, আইনস্টাইন, আমাদের দেশের রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র, প্রেমচন্দ, সুব্রহ্মণিয়ম ভারতী, ভগৎ সিংরা মুগ্ধ হয়ে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। এটা গভীর বেদনার কথা যে, সেই সোভিয়েত সমাজতন্ত্রকে বাইরের সাম্রাজ্যবাদ ও ভেতরের প্রতিবিপ্লবী পুঁজিবাদ ধ্বংস করেছে। কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। ১৮৭১ সালে ফ্রান্সে শ্রমিক শ্রেণি বিপ্লব করে প্যারি কমিউন প্রতিষ্ঠা করে কয়েকমাস টিকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত রক্ষা করতে পারেনি। কারণ তারা অনভিজ্ঞতার জন্য বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে ভেঙে শ্রমিক-রাষ্ট্র গড়েনি। এর থেকে মার্কস শিক্ষা নিয়েছিলেন। লেনিন সেই শিক্ষা রাশিয়ায় প্রয়োগ করেছিলেন। তেমনি সোভিয়েত সমাজতন্ত্রও স্ট্যালিনের নেতৃত্বে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞানে প্রভূত অগ্রগতি ঘটিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেও অতিক্রম করেছিল। বিভিন্ন দেশের মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা আন্দোলনকে সাহায্য করেছিল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্যাসিস্ট শক্তিকে পরাস্ত করেছিল। কিন্তু অর্থনৈতিক কাঠামোতে পুঁজিবাদকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করলেও উপরিকাঠামোতে আদর্শগত-সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের প্রভাব, বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদের প্রভাব — যেটা কমরেড ঘোষের ভাষায় সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিবাদের প্রভাব, তার বিরুদ্ধে কার্যকরী সাংস্কৃতিক বিপ্লব করতে পারেনি এবং এই উপরিকাঠামো থেকেই পুঁজিবাদ আক্রমণ করে সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করল। এটাই কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়ে গেছেন। এর থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামী দিনে দেশে দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এগোবে ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে। মনে রাখবেন, সোভিয়েত সমাজতন্ত্র আজ টিকে থাকলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ইরাক, আফগানিস্থান, লিবিয়া, সিরিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যে ধ্বংসকাণ্ড চালাতে পারত না ; ইসলামিক-হিন্দু-খ্রিস্টিয় ধর্মীয় মৌলবাদ মাথাচাড়া দিতে পারত না এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অকুপাই ওয়াল স্ট্রিটের আন্দোলনকারীরা, ইউরোপের ধর্মঘটী শ্রমিকরা, 'আরব বসন্তে'র আন্দোলনকারীরা যথার্থ মুক্তিসংগ্রামের পথ খুঁজে পেত। মনে রাখবেন সমাজতন্ত্র কোনও ব্যক্তি চেয়েছে বলে আসেনি। এসেছে ইতিহাসের নিয়মে। যেমন আদিম সমাজ পাল্টে দাসপ্রথা, তারপর রাজতন্ত্র বা সামন্ততন্ত্র, এবং তারপর পুঁজিবাদ

এসেছে, তেমনি সমাজতন্ত্রও এসেছে, ৭০ বছর টিকে থেকে নতুন শ্রমিকসভ্যতা কাকে বলে দেখিয়ে দিয়ে গেছে। আবারও সমাজতন্ত্র আসবে দেশে দেশে আরও সমৃদ্ধ রূপে।

মার্কসবাদের ওপর আস্থা রাখবেন। মনে রাখবেন, মার্কসবাদে কোনও মনগড়া ধারণার স্থান নেই। সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক দর্শন। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ নিয়ত পরিবর্তনশীল প্রকৃতিজগতের, বস্তুজগতের গতির নিয়মকে পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে আবিষ্কার করেছে। মার্কস বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার আবিষ্কৃত সেই নিয়মগুলিকে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে সংযোজিত, সম্মিলিত করে তার থেকে সাধারণ নিয়মগুলিকে আবিষ্কার করেছেন, যা সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি, মানবসমাজ ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে, বিজ্ঞানের সকল বিভাগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সেই জন্য মার্কসবাদ বিজ্ঞান। মার্কসবাদই প্রথম দেখিয়েছে, কোন নিয়মে আদিম সমাজ থেকে দাসতন্ত্র, দাসতন্ত্র থেকে সামন্ততন্ত্র এবং সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদ এসেছে, আবার সেই নিয়মেই পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্র, তারপর সাম্যবাদ আসবে। পরবর্তীকালে আরও উন্নততর ব্যবস্থা আসবে। বুর্জোয়ারা বিজ্ঞানকে শিল্পে, কৃষিতে, নির্মাণশিল্পে, যানবাহনে, চিকিৎসায়, জল-স্থল-সৌরজগতে কাজে লাগায়। কিন্তু মার্কসবাদী বিজ্ঞানকে ভয় পায়। কারণ এতে পুঁজিবাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান যেমন গ্যালিলিও, নিউটন, আইনস্টাইন থেকে শুরু করে পরবর্তীতে আরও অনেক বিজ্ঞানীর দ্বারা এগিয়ে চলেছে, তেমনি মার্কসবাদও মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে তুং-শিবদাস ঘোষের দ্বারা ক্রমাগত সমৃদ্ধ ও উন্নত হয়ে চলেছে। আজকের দিনে এই বিপ্লবী মতবাদের উন্নত রূপ হচ্ছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা। আমাদের দল এই শক্তিশালী বৈপ্লবিক মতবাদকে হাতিয়ার করে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করার লক্ষ্য নিয়ে শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রাম ও গণআন্দোলন গড়ে তুলছে। আপনারাও এগিয়ে আসুন, এলাকায় এলাকায় গণকমিটি ও ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তুলুন, চরিত্র গঠনের জন্য উন্নততর সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলুন। মনে রাখবেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আজ পচাগলা শবদেহের মতো। সমস্ত পরিবেশকে কলুষিত করছে। মানবসভ্যতাকে বাঁচাতে হলে একে বিপ্লবের আঘাতে ধ্বংস করে নতুন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। তাই আমাদের দলকে সর্বাত্মকভাবে সাহায্য করুন, আপনাদের ঘরের ছেলেমেয়েদের আমাদের দলের বিপ্লবী আন্দোলনে সামিল করান। আজ চাই হাজার হাজার ক্ষুদিরাম-ভগৎ সিং-চন্দ্রশেখর আজাদ-আসফাকউল্লা-প্রীতিলতা যাঁরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার পতাকা বহন করবে, জীবন দিয়ে লড়বে। এখানেই শেষ করছি।